ভারতের অধিবাসী

(भारतेर आधिबासी)

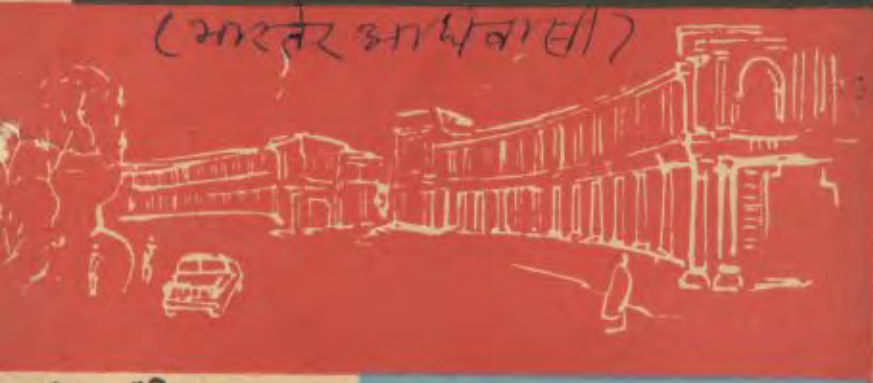

নতুন অনুমোদিত সিলেবাস অনুসারে তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্য

According to new Syllabus for Class III

ভারতের অধিবাসী

লেখক—শ্রী সান্তারাম বৎস

অনুবাদিকা

শ্রীমতী অণিমা নন্দী,

শিক্ষিকা—শ্যামাপ্রসাদ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস

নইসড়ক—দিল্লী।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

ভারতের দূরবর্ত্তী ও নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের অধিবাসী।

বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	আমাদের দেশ	১
২।	গম উৎপাদনকারী কৃষক	১০
৩।	মরুভূমির অধিবাসী	১৬
৪।	ইক্ষু উৎপাদনকারী কৃষক	২১
৫।	ধান্য উৎপাদনকারী কৃষক	২৫
৬।	চা-উৎপাদনকারী সম্প্রদায়	২৯
৭।	সুদূর দক্ষিণের ধীবর সম্প্রদায়	৩৪
৮।	নাগা সম্প্রদায়	৩৯
৯।	উচ্চ পার্ব্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী	৪৩
১০।	খনি অঞ্চলের শ্রমিক সম্প্রদায়	৪৮
১১।	জামসেদপুরের শিল্প শ্রমিক	৫২
১২।	বোম্বাই বন্দরের কর্ম্মব্যস্ত ব্যবসায়ী ...	৫৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতের সকল প্রদেশের লোকই আমাদের প্রয়োজনে সাহায্য করে।

১।	(ক) জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় (প্রাচীন যুগে) ...	৬২
২।	(খ) জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় (বর্ত্তমান যুগে) ...	৬৮

বিষয় পৃষ্ঠা

৩। দূরাঞ্চলের লোকরা আমাদের জন্য অনেক জিনিষ তৈরী করে ৭৭

৪। কাপড়ের কাহিনী ৮৪

তৃতীয় অধ্যায়

লোকেরা পরস্পর মিলেমিশে থাকে।

১। ডাকঘর ও তারঘর আমাদের জন্য কি কি কাজ করে? ৯০

২। রেলযাত্রা সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য ৯৭

৩। সার্ব্বজনীন সম্পত্তির যত্ন নেওয়া ১০৬

৪। সমাজ সমস্যা দূরীকরণে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান

(ক) গ্রাম পঞ্চায়েত ১১৩

(খ) মিউনিসিপ্যাল কমিটি ১১৮

৫। শিশু দিবস ১২২

भारत का मानचित्र

कश्मीर
पंजाब
राजस्थान
नेपाल
भूटान
असम
TEA
उत्तर प्रदेश
बिहार
गुजरात
मध्य प्रदेश
उड़ीसा
बम्बई
महाराष्ट्र
आन्ध्र
मैसूर
मद्रास
केरल

১—আমাদের দেশ

শিক্ষক—আজ নতুন শ্রেণীর পড়া আরম্ভ হবে। প্রথমে আমি তোমাদের নিজেদের দেশের সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই।

আমরা দিল্লীতে বাস করি। দিল্লী ভারতবর্ষের রাজধানী—মস্ত বড় শহর। ভারতবর্ষের সব প্রদেশের লোকই এখানে বাস করে। বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, শিখ, মান্দ্রাজী, গুজরাটি, রাজস্থানী, পাহাড়ী সবরকমের লোকই এখানে আছে। কিন্তু এদের পোষাক পরিচ্ছদ খাওয়া দাওয়া সবই আলাদা আলাদা—কারো সঙ্গে কারো কোনমিল নেই। আমাদের বিদ্যালয়েও নানা প্রদেশের ছেলেমেয়েরা পড়ে। সেজন্য তোমাদের সবারই পরস্পরের চলাফেরা, থাকাখাওয়া, পোষাক পরিচ্ছদ, কাজকর্ম্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে জেনে রাখা দরকার। সেই সঙ্গে সঙ্গে এটাও জানা উচিত যে ভারতবর্ষের এক এক অঞ্চলের অধিবাসীরা অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের কি ভাবে এবং কতখানি সাহায্য করে।

ভারতবর্ষে দিল্লীর মত আরও বড় বড় শহর আছে। গ্রামের সংখ্যা তো কয়েক লক্ষই হবে।

শহরে বেশীর ভাগ ধনী ও মধ্যবিত্ত লোকরা বাস করে। গ্রামে দরিদ্র কৃষকের সংখ্যাই বেশী।

ভারতবর্ষের সব জায়গার আবহাওয়া সমান নয়। একই সময়ে হয়ত কোথাও খুব শীত আবার কোথাও খুব গরম পড়ে। কোন কোন জায়গায় শীত গ্রীষ্ম কোনটাই বেশী নয়। কোথাও বৃষ্টিপাত বেশী আবার কোথাও বৃষ্টিপাত কম। সব জায়গাও একরকম নয়। কোথাও উঁচু পাহাড়, কোথাও সমতল প্রান্তর আবার কোথাও বা মরুভূমি।

ভারতবর্ষের কোন জায়গায় গম উৎপন্ন হয়, কোন জায়গায় ধান! কোথাও আখের ক্ষেত আছে,—কোথাও বা আছে চা এর বাগান। কোথাও আপেল, বেদানা, নাসপাতি ইত্যাদি ভাল ভাল ফল উৎপন্ন হয়, আবার কোথাও বালু প্রধান মাটীতে একেবারেই কিছু উৎপন্ন হয় না।

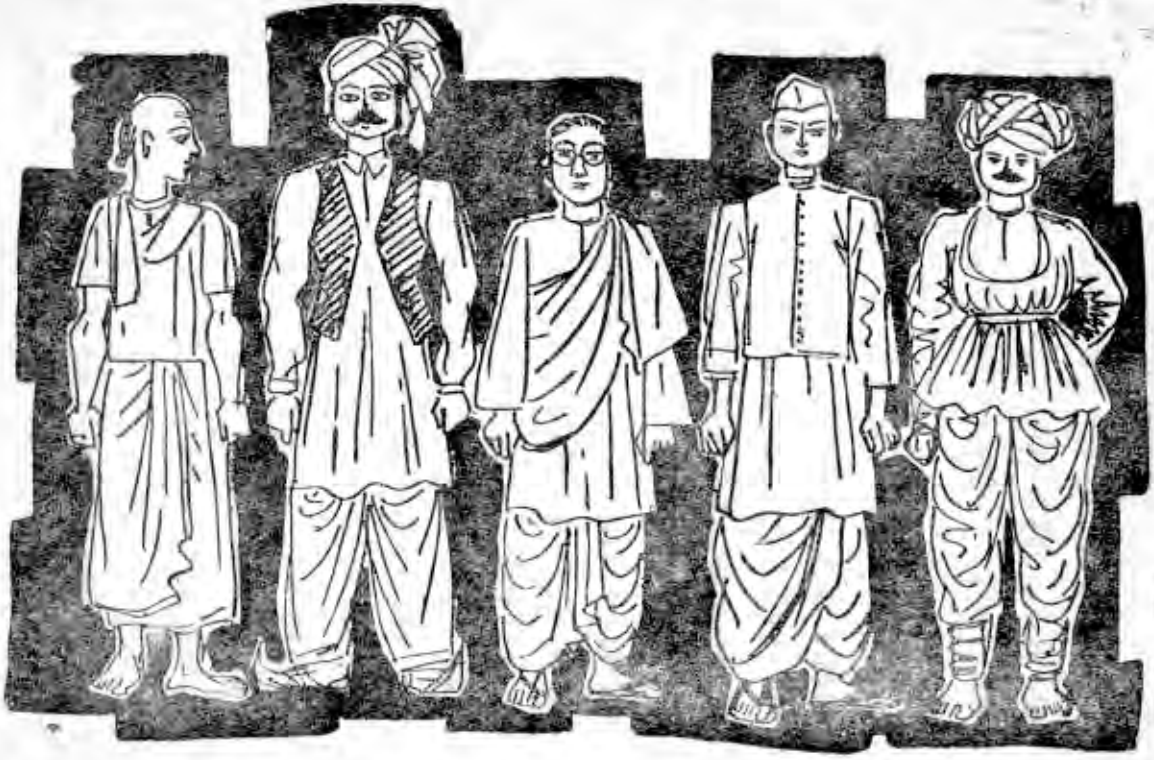

ভারতবর্ষের লোকেরা নানা উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করে থাকে। কেউ কারখানায় কাজ করে, কেউ খনিতে কাজ করে, কেউ কৃষিকার্য্য করে আবার কেউ বা দপ্তরে কাজ করে।

পোষাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও ঠিক সেইরকম। কোন জায়গার লোক ধুতি, কুর্ত্তা পরে, কোন জায়গার লোক সার্ট পাজামা পরে। কোন জায়গায় গরম কাপড়ের প্রয়োজন হয়, আবার কোন জায়গায় সুতোর কাপড়েই কাজ চলে যায়।

কোন জায়গার লোকেরা আটার রুটি খায়, কোন জায়গার লোকেরা ভাত খায়। কোথাও চা পানের রীতি প্রচলন আছে কোথাও বা ঘোলের।

ঘর বাড়ীও সকলের একরকম নয়। কোথাও পাকা বাড়ী, কোথাও কাঁচা বাড়ী, আবার কোথাও খড়ের তৈরী কুঁড়ে ঘর। কোন বাড়ীর ছাদ ঢালু হয়, আবার কোন বাড়ীর ছাদ হয় সমান।

ভারতবর্ষকে একটা ফুল বাগানের সঙ্গে তুলনা করা যায়। বাগানে যেমন নানারকম ফুল ফোটে—লাল, নীল, গোলাপী, হলদে—কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল নেই—না রূপে, না বর্ণে, না গন্ধে, ঠিক সেইরকম ভারতের এক প্রদেশের লোকের সঙ্গেও অন্য প্রদেশের লোকের কোন মিল নেই। প্রত্যেকেরই পোষাক পরিচ্ছদ, আহার বিহার,

কথাবার্ত্তা, আচার ব্যবহার, ঘর বাড়ী ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য রয়ে গেছে। কিন্তু এ বিচিত্রতা আছে বলেই ভারতের

সৌন্দর্য্য বেড়েছে। তোমরা কি কখনও বিশাল বটগাছ দেখেছ? বটগাছ থেকে অনেক ঝুরি নেমে এসে মাটিতে

শিকড় গেড়ে বসে যায়। এর ফলে গাছ অনেক দূর অবধি বিস্তৃত হয়। দূর থেকে দেখলে মনে হবে বুঝি অনেকগুলো গাছ সেখানে আছে। কিন্তু কাছে এলে দেখবে সেটা একটাই গাছ। ঠিক সেইরকম আমাদের দেশের বিভিন্নতাও বাহ্যিক। প্রকৃত পক্ষে আমরা সকলেই এক।

এক প্রদেশের সঙ্গে আর এক প্রদেশের এই যে পার্থক্য তার কারণ হচ্ছে জলবায়ু। জলবায়ু অনুসারে এক এক অঞ্চলের লোকদের এক এক রকম পোষাক পরতে হয়। জলবায়ু অনুযায়ী যে অঞ্চলে যে রকম শস্য উৎপন্ন হয় সে অঞ্চলের লোকদের খাদ্যও সে রকমই হয়।

কিন্তু এত সব বিভিন্নতা সত্ত্বেও কয়েকটি বিষয়ে প্রত্যেকেরই মিল আছে। প্রত্যেকেরই জীবন ধারণের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন, লজ্জা নিবারণের জন্য বস্ত্রের প্রয়োজন এবং আশ্রয়ের জন্য গৃহের প্রয়োজন হয়।

হাজার হাজার শহর ও লক্ষ লক্ষ গ্রাম মিলে এই ভারতবর্ষ তৈরী হয়েছে। আমাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ভারতবর্ষ! কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে হাজার হাজার মাইল বিস্তৃত।

এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যাতায়াত করতে হলে আমরা রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে

থাকি। এমন কি আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যও উড়ো জাহাজ কিম্বা রেলগাড়ীর সাহায্যে একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে পাঠানো হয়ে থাকে।

ডাক ও তারঘর থাকাতেও আমাদের অনেক সুবিধে হয়েছে। আমাদের আত্মীয় স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের খবরাখবর নিতে হ'লে কিংবা কারো কাছে কোন জিনিষ পাঠাতে হলে আমরা ডাকঘরের সাহায্যে পাঠাতে পারি।

তোমরা একথা নিশ্চয় জান যে কোন মানুষই নিজের প্রয়োজনীয় সব কিছু জিনিষ নিজে তৈরী করতে পারে না। এমন কি এক অঞ্চলেও সব রকম শস্য উৎপন্ন হয় না। তারজন্য অন্যান্য অঞ্চলের উৎপন্ন দ্রব্যের ওপর আমাদের নির্ভর করতে হয়। অর্থাৎ অন্যের সাহায্য ছাড়া আমরা একপাও চলতে পারিনা। জীবন ধারণের জন্য প্রত্যেককেই প্রত্যেকের সাহায্য নিতে হয়। ভারতবর্ষের এক প্রদেশের লোকেরা কি ভাবে অন্য প্রদেশের লোকদের সাহায্য করে সেটা তোমরা এর পরে ক্রমে ক্রমে জানতে পারবে।

অনুশীলনী

কি কি শিখলে ?—

১। প্রত্যেকেরই খাদ্য, বস্ত্র ও গৃহের প্রয়োজন আছে।

২। নিজেদের আবশ্যকতা পূর্ণ করবার জন্য আমাদের অন্য প্রদেশের উৎপন্ন দ্রব্যের উপরে নির্ভর করতে হয়।

৩। ভারতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। তাদের আহার বিহার, পোষাক পরিচ্ছদ, রীতিনীতি সবই ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু এই বৈচিত্র আছে বলেই ভারতবর্ষ এত মহান্।

৪। ডাক-তার ও রেলের সাহায্যে আমরা সংবাদ পাঠাতে পারি ও এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যাতায়াত করতে পারি।

বলতে পার ?—

১। আমরা কোন দেশে বাস করি ?

২। আমাদের দেশের রাজধানীর নাম কি ?

৩। আমাদের দেশে গ্রামের সংখ্যা বেশী কি শহরের সংখ্যা বেশী ?

৪। এক এক অঞ্চলের লোকেদের খাওয়া দাওয়া এক এক রকম হয় কেন ?

খেলা ধূলায়—

১। ভারতবর্ষের মানচিত্র আঁক।

২। একটা ছবির এ্যালবাম তৈরী কর। তাতে নিজেদের দেশ সংক্রান্ত ছবি লাগাও। এই সমস্ত ছবি তোমরা খবরের কাগজ এবং অন্যান্য বই থেকেই সংগ্রহ করতে পার।

২—গম উৎপাদনকারী কৃষক

শিক্ষক—অজয়, বলতো তোমরা যে আটার রুটি খাও সেটা কিসের থেকে তৈরী হয়?

অজয়—আটা তো গম থেকে তৈরী হয়, স্যার।

শিক্ষক—হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, কিন্তু এটা বোধহয় জান না এই গম কোথা থেকে কেমন করে আসে এবং কারা তৈরী করে? সেই জন্য আজ আমি তোমাদের এই গম উৎপাদনকারী লোকদের সম্বন্ধে বলবো।

এই সব লোকেরা দিল্লীর উত্তর পশ্চিমে প্রান্তর এলাকায় বাস করে। সেখানে অনেক গ্রাম আছে। গ্রামের

লোকেরা সাধারণতঃ কৃষিকার্য্য করেই জীবিকা নির্বাহ করে। এরা মাটির ঘরে থাকে। কোন কোন কৃষকের ঘর অবশ্য পাকাও হয়। এরা যে সমস্ত বাড়ীতে থাকে তাদের ছাদগুলি বেশ সমতল। এখানের লোকেরা বছরের অধিকাংশ সময়ই খোলা মাঠে কিংবা ছাদের ওপরে ঘুমোয়। কিন্তু শীতকালে যখন অতিরিক্ত ঠাণ্ডা পড়ে তখন তাদের ঘরের ভেতরেই শুতে হয়। এখানে গ্রীষ্মকালে যেমন খুব গরম পড়ে, তেমনি শীতকালেও প্রচণ্ড শীত পড়ে। ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকদের পোষাক পরিচ্ছদেরও পরিবর্ত্তন হয়। এরা গ্রীষ্মকালে হাল্কা সূতীর কাপড় পরে এবং শীতকালে মোটা সূতীর ও পশমের তৈরী কাপড় পরে।

এখানে গ্রামের চারপাশেই মাঠ আর ক্ষেত রয়েছে। গ্রামের চারদিকে ঢেউ খেলানো, শস্যশ্যামলা ক্ষেতগুলি দেখতে বড়ই সুন্দর লাগে। এছাড়া এখানে সেখানে অনেক বড় বড় ছায়াবহুল বৃক্ষও দেখা যায়। ক্ষেতগুলির মধ্যে কোন কোনটা খুব বড়, আবার কোন কোন ক্ষেত খুব ছোট। এসব বড় বড় ক্ষেতগুলিকে 'ফার্ম' বলা হয়। কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য এগুলিতে ট্রাক্টার চালানো হয়। ছোট ছোট ক্ষেতগুলিতে বলদের সাহায্যে হাল চাষ করা হয়।

এই এলাকায় বৃষ্টিপাত খুব কম। এজন্য খাল, নালা ও কূয়োর সাহায্যে ক্ষেতে জল সেচন করা হয়। ভাখ্‌রা বাঁধ তৈরী হবার পর থেকে এখানের কৃষকদের ক্ষেতে জল-সেচের খুব সুবিধা হয়েছে। এই বাঁধ থেকে খাল কেটে এবং সেই খাল থেকে আবার অনেক ছোট ছোট খাল কিংবা নর্দ্দমা কেটে তার সাহায্যে ক্ষেতে জল সেচন করা হয়ে থাকে। কোন কোন জায়গায় নলকূপের সাহায্যেও জল-

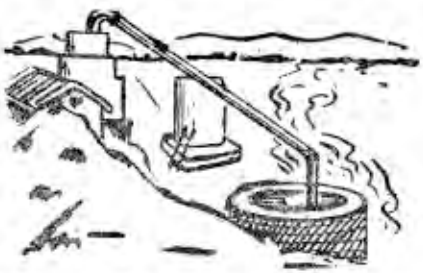

সেচন করা হয়। নলকূপকে এক ধরণের কূয়োই বলা যেতে পারে। এর থেকে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে জল নিষ্কাশন করা হয়।

গমই এখানের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। যখন গম পাকতে আরম্ভ করে তখন সোনালী রং এর হয় বলে দেখতে অবিকল সোনার মতই লাগে।

গমের বীজ শীতের প্রারম্ভে বপন করা হয় এবং এপ্রিল মাসে কাটবার উপযুক্ত হয়। একে রব্বি শস্য বলা

হয়। কৃষকেরা নিজেদের জমিতে গম জোয়ার, সরষে আর ছোলার চাষ করে থাকে।

ক্ষেত থেকে গম কেটে আনার পরে সেগুলিকে বেশ করে মাড়িয়ে আলাদা করা হয়। তারপর নিজেদের প্রয়োজন মত রেখে দিয়ে বাকীটা কৃষকেরা বস্তায় ভরে গরুর গাড়ীতে করে শহরের বাজারে পাঠিয়ে দেয় বিক্রীর জন্য। সেখান থেকে আবার বড় বড় ব্যবসায়ীরা সেই গম কিনে অন্য শহরে নিয়ে যায়। এই অঞ্চলের গম প্রসিদ্ধ। এ রকম সোনালী রং এর মোটা দানা এবং মিষ্টি স্বাদযুক্ত গম অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।

এই অঞ্চলে বছরে দুবার শস্য উৎপন্ন হয়—রব্বি এবং খরিফ্। রব্বি শস্যের বিষয়ে তোমাদের আগেই বলা হয়েছে। খরিফের ফসল জুন জুলাই মাসে বপন করা হয়। এই সময় ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা এবং ধান বোনা হয়ে থাকে। আখ এবং কার্পাসের বীজ মার্চ্চ মাসে বোনা হয়। প্রায় এক বছরে এগুলি কাটবার উপযুক্ত হয়। এছাড়া নানা রকম শাক-সব্জী এবং ফল ও উৎপন্ন হয়।

এখানে বেশ হৃষ্ট পুষ্ট এবং ভাল ভাল গরু, মহিষ ও বলদ দেখা যায়। এই অঞ্চল দুধ এবং দই এর জন্য প্রসিদ্ধ। এখানের লোকেরা আটার রুটি, দুধ, দই, মাখন ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে খায়। সেজন্য এদের দেহ দীর্ঘ,

শক্তিশালী এবং সুগঠিত হয়। এই অঞ্চলের কৃষকেরা কঠোর পরিশ্রমী হয়। এখানের যুবকেরাও খুব সাহসী। এদের মধ্যে অনেকেই সৈন্যদলে যোগ দিয়ে দেশের ও দশের সেবা করে থাকে।

আমাদের মত এরাও নানা রকম পর্ব্ব ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। 'বৈশাখী' এদের একটা বিশেষ পর্ব্ব। এই দিন থেকেই কৃষকেরা প্রথম গম কাটতে সুরু করে। ১৩ই এপ্রিল বৈশাখী উৎসব পালন করা হয়। দশরা, লোরী এবং দেওয়ালী এদের প্রিয় উৎসব। এখানের কৃষকদের ভাঙ্গরা নৃত্য প্রসিদ্ধ। এই অঞ্চলের লোকেরা বেশীর ভাগই পাঞ্জাবী ভাষাতে কথাবার্তা বলে। অবশ্য কেউ কেউ হিন্দীও বলে থাকে।

এই এলাকা পাঞ্জাব নামে পরিচিত। এই প্রদেশ ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত।

অনুশীলনী

কি কি শিখলে—

১। ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমে পাঞ্জাব প্রদেশে প্রচুর গম উৎপন্ন হয়। সেজন্য ঐ অঞ্চলের লোকেরা আটার রুটি খায়।

২। পাঞ্জাবের গরু মহিষেরা খুব দুধ দেয়। সেজন্য সেখানকার লোকেরা যথেষ্ট পরিমাণে দুধ, দই, ঘোল, মাখন ইত্যাদি খায়।

৩। পুষ্টিকর জিনিষ খায় বলে এরা খুব শক্তিশালী হয়। এরা সাহসী এবং কঠোর পরিশ্রমী বলে সরকার এদের সৈন্যদলে ভর্তি করে নেয়।

বলতো ?—

১। পাঞ্জাব কোথায় অবস্থিত ?

২। ভারতবর্ষের মানচিত্রে পাঞ্জাবের অবস্থান দেখাও।

৩। পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ বাঁধের নাম কর।

৪। পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ নৃত্য এবং উৎসবের নাম কি ?

খেলা-ধূলায়—

১। তোমার কোন পাঞ্জাবী বন্ধুর সঙ্গে ভাঙ্গরা নাচ নাচো।

২। গমের শীষ আঁকতে শেখো।

৩—মরুভূমির অধিবাসী

শিক্ষক—আজ তোমরা দিল্লীর দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত মরুভূমি এবং সেখানকার অধিবাসীদের সম্বন্ধে পড়বে।

দিল্লীর দক্ষিণ পশ্চিমে একটা মরুভূমি আছে। এই প্রদেশটা বালুকাময়। মরুভূমির ধারে ধারে অনেক গ্রাম আছে। গাছপালা এখানে খুব অল্পই দেখা যায়। গ্রামের আশে পাশের ভূমি হয় পার্ব্বত্যময় নয়ত বালুকাময়।

এদিকে সেদিকে দূরে দূরে অনেক ক্ষেত দেখা যায়। এই জায়গায় বৃষ্টিপাত খুব কম, গভীর কূপ খনন করে ক্ষেতে জল সেচন করা হয়। কিন্তু সারা বছর এ সমস্ত কূপে জল থাকেনা। গ্রীষ্মকালে এ গুলো শুকিয়ে যায়। সেজন্য

অল্প কয়েক মাসই এসব কূপ থেকে জল নিয়ে জমির কাজে লাগানো হয়। এই সব জমিতে গম, ছোলা, জোয়ার, বাজরা ও সব্জী উৎপন্ন হয়।

অবশ্য বেশীর ভাগ কৃষকেরা বৃষ্টির জলের উপরেই নির্ভর করে। তারা তাদের জমিতে বাজরা, গম ইত্যাদি চাষ করে।

রমেশ—শুনেছি মরুভূমিতে নাকি ভীষণ গরম—একথা কি ঠিক স্যার ?

শিক্ষক—হ্যাঁ! দিনের বেলা সূর্য্যের প্রচণ্ড তাপে যখন বালি গরম হয়ে ওঠে তখন অসহ্য গরম বোধ হয়, কিন্তু রাত্রি বেলা যখন বালি ঠাণ্ডা হয়ে আসে তখন সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা বোধ হয়। ঠিক সেই কারণেই গ্রীষ্মকালে অতিরিক্ত গরম আর শীতকালে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা পড়ে, সারা বছরে অল্প কয়েকদিন মাত্র বৃষ্টি হয়। এখানে জলের অত্যন্ত অভাব। গ্রীষ্মকালে সমস্ত কূপ শুকিয়ে গেলে অবস্থা এমন চরমে পৌঁছয় যে নিত্য ব্যবহারের জল পাওয়াও রীতিমত কষ্টকর হয়ে ওঠে। তখন লোকেরা অনেক দূর দূর থেকে উটের পিঠে করে জল নিয়ে আসে।

প্রদীপ—স্যার! উট ছাড়া মরুভূমিতে অন্য কোনও পশু থাকতে পারেনা ?

শিক্ষক—না, মরুভূমিতে উটই একমাত্র পশু কিন্তু মরুভূমির মাঝে মাঝে যেখানে কিছু কিছু গাছ পালা ও লোক-

বসতি আছে সেখানের কৃষকেরা কেউ কেউ ভেড়া, ছাগল, উট ইত্যাদি পালন করে।

উট এদের পরম বন্ধু। উটকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়। মরুভূমিতে উট খুব তাড়াতাড়ি চলতে পারে। সেই জন্য লোকেরা একস্থান থেকে আর এক স্থানে যেতে হলে উটের পিঠে করেই যাতায়াত করে, তাছাড়া উট এদের আরও অনেক সাহায্য করে। মরু প্রদেশে হাল চালান, গাড়ী টানা এসমস্ত কাজও উটেরাই করে থাকে। উটের পিঠে লোকেরা ভারী ভারী জিনিষ পত্রও বয়ে নিয়ে যায়। উটের আর একটা বিশেষত্ব আছে। এরা একবার পেট ভরে জল খেয়ে নিলে অনেকদিন পর্য্যন্ত জল না খেয়ে থাকতে পারে।

মরু অঞ্চলের সমস্ত গ্রামগুলো এদিকে সেদিকে ছড়ানো রয়েছে এবং একগ্রাম থেকে আর এক গ্রামের দূরত্ব বেশ কয়েক মাইল, যে সময় মাঠে চাষ আবাদের কোন কাজ থাকেনা সে সময় গ্রামবাসীদের অনেকেই অন্য নানারকমের কাজ-কর্ম্ম করে থাকে—যেমন গরু চরানো, কাপড় বোনা, মাদুর বোনা ইত্যাদি, কোন কোন লোক আবার ব্যবসা ও করে। তারা একস্থান থেকে জিনিষপত্র কিনে নিয়ে অন্যস্থানে গিয়ে সেগুলো বিক্রী করে আসে।

মরু অঞ্চলের লোকেরা স্বভাবতঃই খুব হিসেবী হয়।

এরা খুব শক্তিশালী ও সাহসী জাতি। যুবকেরা অনেকেই সৈন্যদলে ভর্ত্তি হয়।

মরু অঞ্চলের লোকেরা অনেকেই আমোদ-প্রিয় হয়। ওরা আমাদের মত দশহরা, দেওয়ালী, দোল এবং রাখী বন্ধন ইত্যাদি উৎসব খুব ধুমধামের সঙ্গে পালন করে।

এখানের স্ত্রীলোকেরা গয়না পরতে ভালবাসে। এরা ঘাঘরা, ওড়না ইত্যাদি পরে। এরা রং বিরং এর কাপড় পরতে খুব ভালবাসে। পুরুষেরা ধুতি আলখাল্লা পরে আর মাথায় পাগ্‌ড়ী বাঁধে।

এ অঞ্চলটা রাজস্থান নামে পরিচিত। এদের ভাষা রাজস্থানী। তবে সাধারণতঃ এরা হিন্দীতেই কথাবার্তা বলে থাকে।

অনুশীলনী

কি কি শিখলে—

১। দিল্লীর দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত বালুকাময় অঞ্চলকে রাজস্থান বলা হয়।

২। রাজস্থানে বৃষ্টি খুব কম হয়।

৩। রাজস্থানের লোকেরা খুব পরিশ্রমী ও সাহসী হয়।

বলতো ?

১। উটকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয় কেন ?

২। রাজস্থানে গ্রীষ্মকালে অতিরিক্ত গরম আর শীতকালে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা পড়ে কেন ?

৩। রাজস্থানের লোক কি কি কাজ করে ?

খেলা খুলায়—

১। তোমাদের লাইব্রেরী থেকে রাজস্থানের বীর রাণা প্রতাপের জীবনী চেয়ে পড়।

২। উটের ছবি আঁক।

৪—ইক্ষু উৎপাদনকারী কৃষক

শিক্ষক—এর আগে তোমরা পাঞ্জাব এবং রাজস্থানের অধিবাসীদের বিষয় পড়েছ। আজ আবার দিল্লীর পূর্ব্বে অবস্থিত একটি অঞ্চলের সম্বন্ধে পড়বে।

এই অঞ্চলে অনেক গ্রাম আছে এবং গ্রামের চারপাশে বড় বড় মাঠ আছে। মাঠগুলিকে আবার অনেকগুলি ছোট ছোট ক্ষেতে ভাগ করা হয়েছে। এখানের বেশীর ভাগ মাঠই সবুজ। জল সেচনের সুবিধার জন্য অনেক জমিতেই কূপ খনন করা হয়েছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কৃষকদের সুবিধার জন্য সরকার পক্ষ থেকে একটি বৈদ্যুতিক নলকূপও বসানো হয়েছে। এর থেকে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে জল নিষ্কাশন

করে জমিতে জল সেচন করা হয়। এছাড়া জমিতে খাল কেটেও জল সেচন করা হয়ে থাকে।

আখই এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। যদিও এখানকার মাটীতে সব রকম শস্যই উৎপন্ন হয়, তবুও বেশীর ভাগ কৃষকই আখের চাষ করে থাকে। প্রায় সব জমিতেই আখের চাষ হয়। খাল কেটে এ সমস্ত জমিতে জল সেচন করা হয়। দশ এগার মাসের মধ্যেই আখ কাটবার উপযুক্ত হয়। আখের চাষ বেশ লাভজনক। একবার বীজ লাগালে তার থেকে পর পর তিনবার আখ পাওয়া যায়। অর্থাৎ যখন আখ কাটবার উপযুক্ত হয় তখন আখের গোড়ার দিকের কিছুটা জমির উপরে রেখে কাটা হয়। পরে এর থেকেই আবার অঙ্কুর বের হয়। আলাদা করে নতুন বীজ লাগাবার আর প্রয়োজন হয় না। এই ভাবে একই বীজ থেকে পর পর তিনবার ফসল পাওয়া যায়।

আখ কাটবার পর গ্রামবাসীরা গরুর গাড়ীতে আখ বোঝাই করে নিকটবর্ত্তী চিনির কারখানায় নিয়ে যায়। সেখানে যন্ত্রের সাহায্যে আখ থেকে চিনি প্রস্তুত হয়। তারপর সেই চিনি রেলগাড়ীর সাহায্যে দেশে দেশে পাঠানো হয়। কোন কোন কৃষক নিজেদের ঘরেই আখ থেকে রস বের করে। তারপর সেই রস জাল দিয়ে গুড় এবং শক্কর

তৈরী করে। অবশ্য এরা আখ ছাড়া গম, তুলো, বীন এবং নানারকম সব্জীরও চাষ করে থাকে।

গ্রামের কৃষকেরা কেবল নিজেদের জন্যই নয়—আশে-পাশের সহরের লোকদের জন্যও যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপন্ন করে। একই জমিতে বছরে কম করে তারা দুরকমের শস্য উৎপাদন করে। একবারের শস্যের জন্য বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয়, আর একবারের শস্য উৎপাদনের জন্য খাল কিংবা কূপ থেকে জল সেচন করা হয়। এই দুরকম শস্য 'রব্বি' এবং 'খরিফ' নামে পরিচিত।

এখানকার লোকেরা হিন্দী ভাষায় কথাবার্তা বলে থাকে। আমাদের মত এরাও দশহরা, জন্মাষ্টমী, দোল এবং দেওয়ালী উৎসব খুব ধুমধামের সঙ্গে পালন করে। পবিত্র গঙ্গা ও যমুনা নদী এই প্রদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। হরিদ্বার, প্রয়াগ, বারাণসী, মথুরা, বৃন্দাবন ইত্যাদি কয়েকটী তীর্থ স্থান এই নদীগুলির তীরে অবস্থিত। পূজো পার্বনের দিনে লোকেরা গঙ্গা যমুনার পবিত্র জলে স্নান করে শুচি হয়। এখানের পুরুষেরা বেশীর ভাগই ধুতি-কুর্তা পরে ও স্ত্রীলোকেরা শাড়ী ব্লাউজ পরে। এই অঞ্চলকে উত্তর প্রদেশ বলা হয়।

অনুশীলনী

কি কি শিখলে—

১। আখের চাষ উত্তর প্রদেশে সবচেয়ে বেশী হয়।

২। একবার বীজ বপন করলে তার থেকে পর পর তিনবার আখ পাওয়া যায়।

৩। দশ এগার মাসে আখ কাটবার উপযুক্ত হয়।

বল তো ?—

১। উত্তর প্রদেশ দিল্লীর কোন্‌দিকে অবস্থিত ?

২। আখের রস থেকে কি কি জিনিষ তৈরী হয় ?

৩। উত্তর প্রদেশের মধ্য দিয়ে কোন্ কোন্ বড় নদী প্রবাহিত হয়েছে ?

৪। উত্তর প্রদেশ ও রাজস্থানের স্ত্রীলোকদের পোষাক পরিচ্ছদে কি পার্থক্য আছে ?

খেলা ধূলায়—

১। মানচিত্রে দেখাও গঙ্গা নদী কোন্ কোন্ প্রদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ?

২। উত্তর প্রদেশে কয়েকটি তীর্থস্থান আছে। মানচিত্রে সেগুলির স্থান নির্দ্দেশ কর।

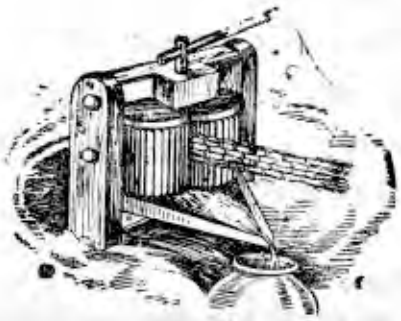

৫—ধান্য উৎপাদনকারী কৃষক

শিক্ষক—সেদিন তোমরা উত্তর প্রদেশের গ্রাম ও সেখানকার অধিবাসীদের সম্বন্ধে জেনেছ। এবার তোমাদের বাঙ্গলাদেশের গ্রাম ও সেখানকার ধান উৎপাদনকারী কৃষকদের বিষয়ে বলবো।

বাঙ্গলা দেশের গ্রামে অনেক রকমের ঘর বাড়ী দেখতে পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও বাঁশ এবং খড় দিয়ে তৈরী কুঁড়ে ঘর রয়েছে। কোন কোন বাড়ী কাঁচা অর্থাৎ মাটি দিয়ে তৈরী হয়েছে। কোন কোন বাড়ী আবার টিন দিয়ে ঘেরা হয়েছে এবং টালি দিয়ে ছাওয়া হয়েছে। এদের

বাড়ীর ছাদ ঢালুভাবে তৈরী। এখানে খুব বৃষ্টি হয়,—যাতে বৃষ্টির জল সহজেই গড়িয়ে পড়তে পারে সেজন্যই বাড়ীগুলির ছাদ ঢালু করে তৈরী করা হয়েছে।

সাধারণতঃ বড় পুকুর অথবা ছোটপুকুরের চারপাশে বাড়ীগুলি অবস্থিত। বাঙ্গলাদেশের পুকুর ও ডোবাতে যথেষ্ট মাছ পাওয়া যায়। এখানের লোকেরা পুকুর থেকে মাছ ধরে এবং পুকুরের জল দৈনন্দিন কার্য্যে ব্যবহার করে। এই অঞ্চলের চতুর্দ্দিকে বহু গাছ পালা আছে—তারমধ্যে অধিকাংশই নারকেল গাছ। নারকেল গাছ নানা উপকারে লাগে। কাঁচা ও পাকা দুই অবস্থায়ই নারকেল সুস্বাদু। লোকেরা নারকেল গাছের পাতা দিয়ে পাখা, চাটাই ও নানারকম জিনিষ তৈরী করে। নারকেলের ছোবড়া থেকেও দড়ি, পাপোষ ইত্যাদি প্রস্তুত হয়।

এই অঞ্চলে গ্রামগুলির চারপাশ জুড়েই সমতল ভূমি আছে। এই সব সমতলভূমিকে আবার অনেকগুলি ছোট ছোট ক্ষেতে ভাগ করা হয়েছে এবং মাঝে মাঝে নালার সাহায্যে একটিকে আর একটি থেকে পৃথক করা হয়েছে। এই নালাগুলি থাকাতে মাঠ থেকে বৃষ্টি অথবা বন্যার জল সহজেই অপসারিত হয়।

রূপেন্দ্র—আচ্ছা স্যার, নদী, নালা বেশী থাকাতে লোকদের আসা যাওয়ার খুব অসুবিধা হয় না?

৫—ধান্য উৎপাদনকারী কৃষক

শিক্ষক—সেদিন তোমরা উত্তর প্রদেশের গ্রাম ও সেখানকার অধিবাসীদের সম্বন্ধে জেনেছ। এবার তোমাদের বাঙ্গলাদেশের গ্রাম ও সেখানকার ধান উৎপাদনকারী কৃষকদের বিষয়ে বলবো।

বাঙ্গলা দেশের গ্রামে অনেক রকমের ঘর বাড়ী দেখতে পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও বাঁশ এবং খড় দিয়ে তৈরী কুঁড়ে ঘর রয়েছে। কোন কোন বাড়ী কাঁচা অর্থাৎ মাটি দিয়ে তৈরী হয়েছে। কোন কোন বাড়ী আবার টিন দিয়ে ঘেরা হয়েছে এবং টালি দিয়ে ছাওয়া হয়েছে। এদের

শিক্ষক—মানবেন্দু, তোমার বাড়ী তো বাঙ্গলা দেশে, একথার উত্তর তুমিই দাও।

মানবেন্দু—আমাদের দেশে যাতায়াতের জন্য নৌকা আছে। সাধারণতঃ লোকেরা এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে নৌকা করেই যাতায়াত করে থাকে।

শিক্ষক—এই প্রদেশে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত বেশী। এখানে বছরে পাঁচ মাস তো বৃষ্টি প্রায় লেগেই থাকে। সে সময় নদী, নালা, মাঠ ঘাট সব জলে ভরে যায়। ধান ও পাট এখানকার প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। আমরা যে ভাত খাই তার চাল পাওয়া যায় এই ধান থেকে।

গ্রীষ্মকালে এখানে খুব গরম পড়ে। এখানকার জল-বায়ু খুব আর্দ্র বলে বেশীরকম ঘাম হয়। এখানের লোকেরা সূতার তৈরী ঢিলে পোষাক পরে। পুরুষেরা ধূতি পাঞ্জাবী ও স্ত্রীলোকেরা শাড়ী ব্লাউজ পরে।

ভাত এবং মাছ দুটোই এদেশের লোকদের প্রিয় খাদ্য। এ দুটো জিনিষই এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

বাঙ্গলা দেশে পূজো পার্ব্বন প্রায় বারমাসই লেগে থাকে। তার মধ্যে দুর্গাপূজো, কালীপূজো, মনসাপূজো ও বসন্তপঞ্চমী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রদেশের অধিবাসীদের বাঙ্গালী বলা হয়। এরা বাংলা ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে। বাঙ্গলা দেশ দিল্লী থেকে অনেক দূরে পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত।

অনুশীলনী

কি কি শিখলে ?—

১। বাঙ্গলা দেশে খুব বৃষ্টি হয়। সেজন্য সেখানে যথেষ্ট ধান উৎপন্ন হয়।

২। বাঙ্গলা দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে পাটও উল্লেখযোগ্য।

৩। বাঙ্গলাদেশের বাড়ীঘরের ছাদ ঢালুভাবে তৈরী।

বল তো ?—

১। ভাত এবং মাছ বাঙ্গালীদের প্রিয় খাদ্য কেন ?

২। পাট থেকে কি কি জিনিষ তৈরী হয়।

৩। বাঙ্গালীদের সবচেয়ে বড় উৎসব কি ?

৪। বাঙ্গলাদেশের ঘরবাড়ী ও পাঞ্জাবের ঘরবাড়ীর নির্ম্মাণ কৌশলের মধ্যে পার্থক্য কি ?

খেলাধূলায়—

১। সমতল ছাদ বিশিষ্ট ঘর ও ঢালু ছাদ বিশিষ্ট কুঁড়ে ঘরের চিত্র আঁক।

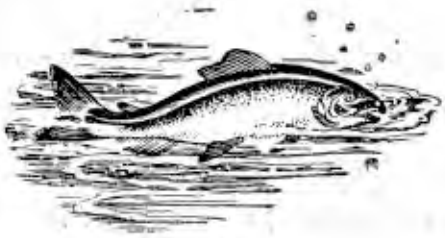

৬—চা-উৎপাদনকারী সম্প্রদায়

শিক্ষক—'চা' এর সঙ্গে তোমাদের সকলেরই পরিচয় আছে। চা হয়না এমন বাড়ী বোধহয় খুব কমই আছে। কিন্তু এই চা কোথায় বা কাদের পরিশ্রমে তৈরী হয় ও কেমন করে আমাদের হাতে এসে পৌঁছয় তা বোধহয় তোমরা অনেকেই জান না।

তোমাদের দেশে চা বেশী হয় সাধারণতঃ আসাম, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির পার্ব্বত্য অঞ্চলে। আজ তোমাদের আমি আসামের চা-বাগান ও সেখানকার অধিবাসীদের বিষয় বলবো।

আসাম ভারতবর্ষের উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত সীমান্ত প্রদেশ। তারপরই ব্রহ্মদেশ সুরু হয়ে গেছে। এটা একটা পার্ব্বত্য অঞ্চল। এর কাছেই পাহাড়। পাহাড় ঘন বন জঙ্গলে আচ্ছাদিত বলে দূর থেকে সবুজ রং এর দেখায়। আসামের এই সব জঙ্গলে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাঠ পাওয়া যায়।

পাহাড়ের তরাই অঞ্চলে অনেক গ্রাম আছে। এই সব গ্রামে যারা বাস করে তাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। এদের বাড়ীগুলিতে সাধারণতঃ টিন অথবা টালির আচ্ছাদন থাকে। বৃষ্টির জল যাতে জমতে না পারে সেই জন্য বাড়ীর ছাদ ঢালু করে নির্ম্মাণ করা হয়। এই প্রদেশে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত বেশী। বছরে প্রায় আট মাসই এই অঞ্চলে বৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশী বৃষ্টিপাত এই আসামের চেরাপুঞ্জি নামক স্থানেই হয়ে থাকে।

ঐ অঞ্চলে গ্রামগুলির চারপাশে শস্যশ্যামল ধানের ক্ষেত আছে। ক্ষেতগুলি ক্রমশঃ ঢালু বলে দূর থেকে দেখলে মনে হয় কেউ যেন সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে সেগুলি সাজিয়ে রেখেছে।

আসামের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য 'চা'। পাহাড়ের নীচে ঢালু জায়গাটা আগে খুব বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। কয়েক বছর হ'ল লোকেরা ঐ জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে 'চা' এর

চাষ আরম্ভ করেছে। এখন সে সব জায়গায় সুন্দর 'চা' বাগান গড়ে উঠেছে। এ জায়গাটা 'চা' চাষের পক্ষে খুবই উপযুক্ত। কারণ চা এর জন্য ঢাল জমি এবং প্রচুর বৃষ্টি-পাত এই দুটো জিনিসেরই দরকার হয়। যাতে বৃষ্টি হবে অথচ 'চা' বাগানে জল দাঁড়াবে না—বয়ে চলে যাবে। আসামে এই দুটো সুবিধেই আছে। বৃষ্টি বেশী হলেও বাগানের কোন ক্ষতি হয় না। জমি ঢালু বলে জল জমে না—অনায়াসেই বয়ে চলে যায়।

গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ সকলেই বেশ কর্ম্মঠ। এখানের স্ত্রীলোকেরা প্রত্যেকদিন 'চা' পাতা তুলবার জন্য বাগানে যায়। তাদের পিঠের সঙ্গে একটা করে ঝুড়ি বাঁধা থাকে। সেই ঝুড়িতে তারা প্রথমে পাতাগুলি সংগ্রহ করে। তারপর নিকটবর্ত্তী কারখানায় সেগুলি বয়ে নিয়ে যায়। সেখানে প্রথমে পাতাগুলি ছোট বড় অনুযায়ী আলাদা করে বেছে নিয়ে শুকিয়ে নেওয়া হয়। তারপর প্যাকেট বা কৌটোতে বন্ধ করে ফেলা হয়। সর্ব্বশেষে সেগুলিকে বাক্স বন্দী করে নৌকা, রেল অথবা লোকের মাথায় চাপিয়ে বাজারে পাঠানো হয়।

অবশ্য এখানে যে কেবল 'চা' এরই চাষ হয় তা নয়, কোন কোন কৃষক তাদের মাঠে রেশম কীটেরও চাষ করে

এবং তার থেকে রেশমী বস্ত্র তৈরী করে। এদের তৈরী রেশমী কাপড় খুব বিখ্যাত। এই প্রদেশের ডিগ্‌বয় নামক স্থানে কেরোসিন তেলের খনি আছে।

এই অঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসীরা অসমীয়া ভাষাতে কথাবার্তা বলে থাকে। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশ থেকে এখানের চা-বাগানে কাজ করতে আসে তাদের ভাষা আবার অন্য রকম—যেমন বাংলা, হিন্দী ইত্যাদি। কাজ চালাবার মত হিন্দী প্রায় সকলেই জানে।

আসামীদের মধ্যেও অনেক উৎসবের প্রচলন আছে। নাচ-গান এদের খুব প্রিয়। নিজেদের পর্ব্ব বা উৎসবগুলি এরা খুব ধূমধাম সহকারে পালন করে।

অনুশীলনী

কি কি শিখলে ?—

১। আসাম ভারতবর্ষের উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত সীমান্ত প্রদেশ।

২। আসামে অনেক 'চা' বাগান আছে।

৩। আসামের ডিগ্‌বয় নামক স্থানে কেরোসিন তেলের খনি আছে।

৪। আসামের রেশমী কাপড় বিখ্যাত।

বলতো ?—

১। আসামে 'চা' এর উৎপাদন বেশী হয় কেন ?

২। ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশী বৃষ্টি কোন্‌খানে হয় ?

৩। আসামের লোকদের প্রধান উপজীবিকা কি ?

৪। পাঞ্জাব ও আসামের ক্ষেতগুলির মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

খেলা ধূলায়—

১। ভারতবর্ষের মানচিত্রে আসাম প্রদেশ দেখ।

২। 'চা' বাগানের ছবি আঁক।

৭—সুদূর দক্ষিণের ধীবর সম্প্রদায়

শিক্ষক—ভারতবর্ষের দক্ষিণে কেরল নামে একটা প্রদেশ আছে। আজ তোমরা কেরলের অন্তর্গত গ্রাম এবং সেখানকার জেলে অধিবাসীদের সম্বন্ধে জানতে পারবে।

কেরল ভারতবর্ষের সবচেয়ে ছোট প্রদেশ। এর একদিকে আরবসাগর অন্যদিকে মান্দ্রাজ ও মহীশূর প্রদেশ অবস্থিত।

এখানে জেলেরা সমুদ্রতীরে সারি সারি ঘর বেঁধে বাস করে। বাস্তবিক পক্ষে এটা বোঝা শক্ত যে কোথায় একটা বস্তি শেষ হয়েছে এবং কোথায় আর একটা বস্তি আরম্ভ হয়েছে। কোনও কোনও জায়গায় সমুদ্রের জল ভিতরে প্রবেশ করাতে

বাড়ীগুলি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এদের কুড়েঘর ও বাড়ীর ছাদ প্রায় বেশীর ভাগই অসংখ্য লম্বা লম্বা নারকেল গাছের নীচে ঢাকা পড়ে গেছে। সেজন্য দেখতে বড়ই সুন্দর লাগে। এদের বাড়ীর ছাদ ও ঢালুভাবে তৈরী। বছরে ছয়মাস এখানে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয়। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে চারিদিক সবুজ ঘাসে ভরা থাকে।

এখানে খাল এবং লবণাক্ত হ্রদগুলোতে নৌকা চলাচলের দৃশ্য খুবই সুন্দর দেখায়। সমুদ্রতীরের বন্দরে বড় বড় জাহাজ নোঙ্গর করে থাকে। সকালের দিকে সমস্ত জাহাজ একসঙ্গে সমুদ্র যাত্রা করে। কখনও বা জোয়ারের জল সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের যাত্রা সুরু হয়ে যায়।

কেরলবাসীদের প্রধান উপজীবিকা মাছ ধরা। জেলেরা মাছ ধরবার জন্য প্রায় সারাদিনই সমুদ্রে কাটায়। ছোটবেলা থেকেই এরা নৌকা চালানোতে অভ্যস্ত। এরা খুব সুদক্ষ নাবিক এবং সাহসী হয়।

এই জেলেদের মধ্যে কারো কারো আবার মোটর বোট আছে। ভাল ভাল মাছ ধরবার জন্য তারা মোটর বোটে করে গভীর সমুদ্রে চলে যায়। গভীর সমুদ্রে বেশী এবং বড় বড় মাছ পাওয়া যায়।

এই অঞ্চলে কয়েকটি পাহাড়ও আছে। সেগুলি জঙ্গলাকীর্ণ। তার মধ্যে খানিকটা জঙ্গল রবার চাষের জন্য

পরিষ্কার করা হয়েছে। এইসব জঙ্গলে সেগুন গাছ আছে। সেগুন গাছের কাঠ অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান। সেগুন কাঠ দিয়েই এখানের লোকেরা তাদের নৌকা তৈরী করে। এখানে নারকেল গাছও প্রচুর। নারকেলের পাতা পাখা, চাটাই ইত্যাদি তৈরী করবার কাজে আসে। নারকেলের ছোব্ড়ার সাহায্যে দড়ি প্রস্তুত করা হয়। কাঁচা নারকেল অর্থাৎ ডাবের শাঁস তোমরা খেয়েছ নিশ্চয়? এছাড়া নারকেল থেকে তেলও বের করা হয়।

এই অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত নীচু জায়গায় ধানের ক্ষেত আছে। একথা তোমরা জানই যে, যেখানে বৃষ্টি বেশী হয় সেখানে ধানের চাষ ভাল হয়। বাংলা দেশের লোকদের মত এখানকার লোকদেরও প্রধান খাদ্য ভাত এবং মাছ। ঘি এবং সরষের তেলের পরিবর্তে এরা নারকেল তেল ব্যবহার করে থাকে। গোলমরিচ ও এলাচ এই প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

এই প্রদেশের প্রধান বিশেষত্ব এই যে এখানকার সব লোকই প্রায় লেখাপড়া জানে। এখানের ভাষা মলয়ালম্।

এখানকার গ্রামে মন্দির, মস্‌জিদ এবং গির্জ্জা সবই আছে। প্রতি গ্রামেই বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় আছে। বড়দিন ও ওনাম্ উৎসব এরা খুব আড়ম্বর ও জাঁকজমকের সঙ্গে পালন করে থাকে। ওনাম উৎসব দশদিন পর্য্যন্ত

চলে। আষাঢ় মাসের শেষ দিকে ও শ্রাবণ মাসের প্রথম দিকে এই উৎসব হয়।

অনুশীলনী

কি কি শিখলে ?—

১। কেরল প্রদেশ আরব সাগরের তীরে অবস্থিত।
২। সমুদ্র থেকে মাছ ধরাই কেরলের লোকদের প্রধান উপজীবিকা।
৩। কেরলের বনভূমিতে রবার এবং সেগুন গাছ উৎপন্ন হয়।
৪। কেরলে প্রচুর গোলমরিচ ও এলাচ উৎপন্ন হয়।

বল তো ?—

১। নারকেল গাছ থেকে কি কি জিনিষ তৈরী হয় ?
২। কেরলের প্রধান উৎসব কি ?
৩। কেরল প্রদেশের লোকরা কোন্ ভাষায় কথা-বার্ত্তা বলে ?
৪। কেরল ও পাঞ্জাবের লোকদের খাওয়া দাওয়ার মধ্যে পার্থক্য কি এবং কেন ?

খেলাধূলায়—

১। ভারতবর্ষের মানচিত্রে কেরল প্রদেশ এবং আরব সাগরের অবস্থান নির্দ্দেশ কর।

২। মাছ এবং নৌকার ছবি আঁক।

৮—নাগা সম্প্রদায়

শিক্ষক—তোমরা আসাম এবং সেখানের চা-বাগানের গল্প আগেই শুনেছ, এবার শোন আসামের পাহাড়ী অঞ্চল আর সেখানকার লোকদের গল্প।

আসাম প্রদেশে একটা পাহাড় আছে, তার নাম নাগা। ঐ পাহাড়ে যে সব লোক বাস করে তাদেরও বলা হয় নাগা। এই পাহাড়ে খুব ঘন জঙ্গল আছে। নাগারা কাঠ ও বাঁশ দিয়ে নিজেদের ঘর তৈরী করে। এদের গ্রামের আশে পাশে খাল কিম্বা ঝর্ণা থাকে। সেখান থেকেই তারা নিত্য ব্যবহারের জল নেয়। এখানে বৃষ্টি বেশী হয় বলে এদের বাড়ী ঘরের ছাদ ঢালু করে তৈরী করা হয়। কারণ ছাদ ঢালু থাকায় বৃষ্টির জল সহজেই গড়িয়ে যায়।

নাগাদের এক একটা গ্রাম খুব বড় বড় হয়। এরা পাথরের দেওয়াল দিয়ে নিজেদের গ্রামটাকে ঘিরে নেয়। যাতায়াতের সুবিধার জন্য দেওয়ালের গায়ে ফাটক থাকে। কয়েকজন লোক এই ফটকের কাছে বসে শত্রুদের পাহারা দেয়। কোনরকম বিপদের আভাস পেলেই তারা ঢোল বাজিয়ে গ্রামবাসীদের সতর্ক করে দেয়। নাগাদের অস্ত্র—তীর, ধনুক, ঢাল ও বর্শা। তীর ধনুক ছুড়িতে ও বর্শা চালাতে এরা খুব ওস্তাদ। কোন কোন নাগার কাছে অবশ্য শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য বন্দুকও আছে।

নাগাদের চেহারার সঙ্গে আসামের অন্যান্য অধিবাসীদের মিল নেই। এদের নাক চেপ্টা, রং তামাটে লাল এবং চোখ গাঢ় নীল বর্ণের হয়। এদের দেহ সুগঠিত এবং দৃঢ়। এরা খুব সাহসী জাতি।

গ্রামের বাইরে পাহাড়ের ঢালু অঞ্চলে রয়েছে নাগাদের ক্ষেত। পাহাড়ের পাশে ছোট ছোট ক্ষেতগুলি এমন ভাবে রয়েছে যে দেখলে মনে হয় যেন সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে কেউ সাজিয়ে রেখেছে। নাগা কৃষকেরা ধানের চাষ করে থাকে। এছাড়া আখ, ভুট্টা ও সব্জীর চাষ ও করে। বৃষ্টির জলের সাহায্যেই এ সব ক্ষেতে জল সেচন হয়ে থাকে। নাগাদের মধ্যে কেউ কেউ গরু, মহিষ, মুর্গী ইত্যাদি পালন করে থাকে। আবার কোন কোন নাগা জঙ্গল থেকে মৌমাছির চাক

সংগ্রহ করে তার থেকে মধু এবং মোম বের করে নেয়। পরে ঐ মধু ও মোম বিক্রী করে তারা পয়সা উপার্জ্জন করে।

নাগারা শিকার প্রিয় জাতি। বর্শা ও তীর ধনুকের সাহায্যে এরা বন্য জন্তু শিকার করে। এরা শিকারী কুকুরও পালন করে শিকার খুঁজে বের করতে এই সব কুকুরেরা খুব সাহায্য করে।

নাগা স্ত্রীলোকেরা ঘরে বসে তাঁতে কাপড় বোনে। নাগাদের মধ্যে কেউ কেউ কাঠ দিয়ে নানারকম জিনিষপত্র তৈরী করে নীচের শহরে গিয়ে বিক্রী করে আসে। অনেকে আবার কামার, কুমার, ছুতার ও মুচীর কাজ করেও জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এছাড়া বেত, বাঁশ ইত্যাদির সাহায্যেও এরা নানা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরী করে থাকে। জঙ্গল থেকে সহজেই কাঠ পাওয়া যায় বলে এরা বেশীর ভাগ জিনিসপত্রই কাঠ দিয়ে তৈরী করে।

নাগারা নাচ গান খুব ভালবাসে। নাচের জন্য এরা ভারতের সর্ব্বত্রই সুপরিচিত। নাচের সময় এরা নানারকম জন্তু জানোয়ারের শিং ও রংবেরংএর পাখীর পালক মাথায় বেঁধে নিয়ে নাচে। নাগারা নির্ভীক, সাহসী ও আমোদ-প্রিয় জাতি। বন্য জীবন যাপন করতে এরা খুবই ভালবাসে। নিজেদের গ্রাম ছেড়ে দূরে অন্য কোথাও যাওয়া এরা একেবারেই পছন্দ করে না।

অনুশীলনী

কি কি শিখলে—

১। নাগারা আসামের পার্ব্বত্য অঞ্চলে বাস করে।

২। এরা তীরধনুক বর্শার সাহায্যে শিকার করে।

৩। কৃষিকার্য্য ছাড়া নাগারা অন্যান্য কাজকর্মও করে থাকে।

বল তো?—

১। নাগাদের গ্রামগুলি কি রকম হয়?

২। নাগারা নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কাঠ দিয়ে কেন তৈরী করে?

৩। নাগা স্ত্রীলোকেরা কি কাজ করে?

৪। উত্তর প্রদেশের গ্রাম এবং নাগাদের গ্রামের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

খেলা-ধূলায়—

৫। নাগা লোকদের ছবি যোগাড় করে নিজের এ্যালবামে লাগাও।

———

৯—উচ্চ পার্ব্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী

শিক্ষক—এর আগে তোমরা নাগাদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনেছ, আজ আবার উঁচু পাহাড়ের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তোমাদের কিছু বলবো।

এই পাহাড়ী প্রদেশটা সৌন্দর্য্যের জন্য জগদ্বিখ্যাত। এখানের হ্রদ, ঝর্ণা, বরফে আচ্ছাদিত পাহাড়, শস্যশ্যামলা ক্ষেত ও গ্রাম, ফুল ও ফলভারে অবনত গাছ ইত্যাদি দেখতে সত্যিই খুব সুন্দর লাগে।

এই প্রদেশটা একটা পাহাড়ী প্রদেশ হলেও ঝিলম্ নদীর তীরবর্ত্তী অঞ্চলটা একেবারেই সমতল। এই সমতল

ক্ষেত্র চারিদিকেই পাহাড় দিয়ে ঘেরা। এই সমস্ত পাহাড়ের ঢালু জায়গাটা বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। গাছগুলি এখানে সোজা ও উঁচু হয়ে উঠে গেছে। পাহাড়ের পাদদেশের ভূমি সমতল। এখানের ক্ষেতগুলি একটার ওপর একটা ঠিক সিঁড়ির মত দেখায়। এটা বৃষ্টিবহুল স্থান। এখানে কৃষকেরা কেবল গ্রীষ্মকালেই ধানের চাষ করে। শীতের সময়ে এখানে খুব বরফ পড়ে বলে কোন কিছুর চাষ করা তখন সম্ভব হয় না। একবারের ফসল এদের প্রয়োজনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়—সেইজন্য এখানের লোকরা অন্য কাজকর্ম্ম করেও জীবিকা নির্ব্বাহ করে থাকে।

কোন কোন লোক ফলের চাষ করে—যেমন আপেল, নাসপাতি, বাদাম, আখ্‌রোট ইত্যাদি। কাশ্মীরের আপেল খুব বিখ্যাত—অনেক দূর দূর দেশেও সেগুলো বিক্রী হয়। এখানের কেউ কেউ জাফ্‌রানের চাষ করে থাকে। ভারতবর্ষে জাফ্‌রান একমাত্র কাশ্মীরেই উৎপন্ন হয়।

তোমাদের আগেই বলা হয়েছে যে এটা শীতপ্রধান জায়গা। শীতকালে এখানে খুব বরফ পড়ে। মাঝে মাঝে বৃষ্টিও হয়। পাহাড়গুলি বরফাবৃত থাকে। ঘরের ছাদ, উঠোন, রাস্তা, ক্ষেত যে দিকেই তাকানো যায় খালি বরফ আর বরফ! বাড়ী থেকে বের হওয়া এমন কি এক ঘর থেকে আর এক ঘরে যাওয়া তখন খুবই মুস্কিল

হয়। সেইজন্য এখানের লোকরা এমন সব কাজকর্ম্ম করে—যেগুলো ঘরে বসেই করা চলে, তারজন্য বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। এই সময়টা তারা ঘরে বসে তাঁত বোনা, পশমের কাজ, সূচীশিল্প বা এমব্রয়ডারী, কাঠের ওপর কারু-কার্য প্রভৃতি সূক্ষ্ম কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এই সব কাজে তারা খুব পটু তাদের হস্তশিল্প দেশ বিখ্যাত।

এই প্রদেশের লোকরা ঢিলে ঢালা গরম পোষাক পরে। প্রচণ্ড শীতের সময় এই সব পোষাকের অভ্যন্তরে তারা একরকম আগুনের পাত্র রাখে। তাকে কাংড়ী বলা হয়। কাজ করতে করতে যখন তাদের হাত ঠাণ্ডা, অবশ হয়ে যায় তখন তারা সেই কাংড়ীর জ্বলন্ত কয়লাতে হাত সেঁকে নিয়ে আবার কাজ করতে আরম্ভ করে।

গ্রীষ্মকালে জঙ্গলের পুরানো গাছগুলি কাটা সুরু হয়। যখন বরফ গলতে সুরু করে তখন অনেকেই তাদের ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি পাহাড়ে চরাতে নিয়ে যায়। ভেড়ার লোম থেকে যে পশম পাওয়া যায় তা বিক্রী করে এদের খুব লাভ হয়। শুধু যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্য এদেশটা সুন্দর তা নয়, এখানকার লোকদের চেহারাও খুব সুন্দর হয়।

অনেক দূর দূর থেকে এমন কি বিদেশ থেকে পর্য্যন্ত হাজার হাজার লোক এখানের সুন্দর দৃশ্য—হ্রদ, ঝর্ণা, ফুলের বাগান, পাহাড় ইত্যাদি দেখতে আসে। এখানে

এসে তারা পাহাড়ে চড়ে, হ্রদের জলে সাঁতার কাটে এবং নৌকার ওপর তৈরী ঘরে থেকে খুব আনন্দ উপভোগ করে। নৌকার ওপর এই ঘরগুলিকে 'হাউস্ বোট' বলা হয়। এখানে বরফের ওপরে স্কেটিং করেও লোকেরা খুব আনন্দ পায়। শিকারায় চড়ে হ্রদে ঘুরে বেড়াতে তারা খুব ভালবাসে।

এদেশের লোকরা খুব অতিথি পরায়ণ। যারা এদেশে বেড়াতে আসে তাদের সুখ সুবিধার প্রতি এরা খুব দৃষ্টি রাখে ও সবরকমে সাহায্য করে। অনেক আবার বাইরের লোকদের কাজকর্ম্ম করে নিজেদের জীবিকা অর্জ্জন করে। ভ্রমণকারীদের সঙ্গে এরা খুব ভাল ব্যবহার করে। তাদের কোনরকম কষ্ট যাতে না হয় সে বিষয়েও এদের দৃষ্টি অত্যন্ত সজাগ।

এখানের গ্রামে গ্রামে মন্দির মসজিদ দুই-ই আছে। লোকরা স্ব স্ব ধর্ম্ম অনুযায়ী পূজো করে অথবা নমাজ পড়ে। এখানের হিন্দু মুসলমান একত্র হয়ে সব রকম উৎসব পালন করে। মহরম, ঈদ ও শিবরাত্রি এদের প্রিয় উৎসব।

এই প্রদেশের নাম কাশ্মীর। এখানকার লোকরা কাশ্মীরী ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে থাকে।

অনুশীলনী

কি কি শিখলে ?—

১। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য কাশ্মীর বিখ্যাত।

২। শীতকালে কাশ্মীরে খুব বরফ পড়ে।

৩। প্রতি বছর হাজার হাজার লোক কাশ্মীরে বেড়াতে যায়।

বল তো ?

১। হাউসবোট কাকে বলে ?
২। কাশ্মীরের লোকেরা ঘরে বসে কাজকর্ম্ম কেন করে।
৩। কাশ্মীরের কোন্ ফল প্রসিদ্ধ ?
৪। কাশ্মীরের কারিগর কি কি কাজের জন্য বিখ্যাত ?
৫। কাশ্মীর এবং রাজস্থানের লোকদের কাজকর্ম্মের মধ্যে পার্থক্য কি ?

খেলাধূলায়—

১। আপেলের ছবি আঁক এবং রং দাও।
২। এই বইএ যে ছবি আছে তা দেখে কাশ্মীরের নৌকার ছবি আঁক। কাশ্মীরীরা একে শিকারা বলে।

১০—খনি অঞ্চলের শ্রমিক সম্প্রদায়

শিক্ষক—আজ আমি তোমাদের খনি অঞ্চলের শ্রমিকদের বিষয়ে বলবো। কয়েকবছর হ'লো এই সমস্ত লোকেরা ঐ জায়গায় এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেছে। তার আগে এরা আশেপাশের অঞ্চলেই বাস করতো। কৃষি-কার্য্যই তখন তাদের উপজীবিকা ছিল।

এই প্রদেশটা পাহাড়ী। পাহাড়ের ওপরে ঘন সবুজ জঙ্গল আছে। এখানে বেশ বৃষ্টি হয়। আশেপাশের ক্ষেত-গুলিতে ধানের চাষ করা হয়। এখানের লোকদের প্রধান খাদ্য ভাত। এরা ছোট ছোট কুঁড়েঘর তৈরী করে বাস করে।

এখানে লোহার খনি আছে। শ্রমিকদের কেউ কেউ খনির ওপরে খোলা জায়গায় কাজ করে। তারা মাটী খুঁড়ে কাঁচা লোহা বের করে। কাঁচা লোহা মাটীর সঙ্গে মেশানো থাকে। প্রথমে কাঁচা লোহা ট্রলিতে করে নিকটবর্ত্তী রেল ষ্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর সেখান থেকে সেগুলি কারখানায় পাঠানো হয়। কারখানায় ঐগুলিকে পরিষ্কার করে নিয়ে লোহা তৈরী করা হয়।

শ্রমিকদের মধ্যে অনেকে আবার মাটীর নীচে খনির ভেতরে কাজ করে। এই সব খনি মাটীর অনেক—অনেক নীচে থাকে। সূর্য্যের আলো অথবা নিঃশ্বাস গ্রহণের উপযুক্ত বাতাস খনির ভেতরে একেবারেই প্রবেশ করতে পারে না।

শ্রমিকেরা যাতে ঠিকমত কাজকর্ম্ম করতে পারে সেজন্য এইসমস্ত অন্ধকার খনিগুলি বিদ্যুতের সাহায্যে আলোকিত করা হয় এবং বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশের ব্যবস্থা করা হয়। এইসব খনিতে ওঠানামার জন্য বৈদ্যুতিক লিফ্‌ট থাকে। তোমরা দিল্লীতেও বড় বড় বাড়ী ও অফিসগুলিতে এধরণের লিফ্‌ট দেখতে পাবে। লোকেরা ওপর থেকে নীচে ও নীচে থেকে ওপরে উঠবার সময় লিফ্‌টে করেই যাওয়া আসা করে। বৈদ্যুতিক বোতাম টিপ্‌বার সংগে সংগেই লিফ্‌ট চলতে আরম্ভ করে।

এই সমস্ত খনির নীচেও মাটী খুঁড়ে কাঁচা লোহা বের করা হয়। তারপর বৈদ্যুতিক চলমান যন্ত্রের সাহায্যে

সেগুলিকে মাটীর ওপরে আনা হয়। সেখান থেকে ট্রলি করে প্রথমে রেল ষ্টেশনে এবং পরে কারখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। খনিতে যারা কাজ করে তাদের খুবই পরিশ্রম করতে হয়। খনিতে কাজ করাও খুব বিপজ্জনক। মাঝে মাঝে মাটী ধ্বসে গিয়ে লোকের জীবনান্ত ঘটে। কিন্তু সাহসী শ্রমিকেরা এই সমস্ত বিপদকে গ্রাহ্য করে না। দেশবাসীর সেবার জন্য এরা সবরকম বিপদের ঝুঁকিই মাথায় নিতে প্রস্তুত।

সারাদিন কাজকর্ম্ম করবার পর যখন এরা ঘরে ফিরে আসে তখন খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই খাওয়াদাওয়ার পর দেহমনকে সতেজ ও প্রফুল্ল রাখবার জন্য তারা নাচগানের আয়োজন করে থাকে। বিশেষ বিশেষ পরবের দিন তাদের ছুটি থাকে। আমাদের মত এরাও নানা উৎসব পালন করে থাকে।

এখানের লোকেরা উড়িয়া ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে। এই প্রদেশ উড়িষ্যা নামে পরিচিত।

অনুশীলনী

কি কি শিখলে ?—

১। উড়িষ্যায় লোহার খনি আছে, সেজন্য অনেক লোক খনিতে কাজ করে জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

২। উড়িষ্যা পাহাড়ী প্রদেশ।

৩। কাঁচা লোহা মাটীর সঙ্গে মিশে থাকে। কারখানায় সেগুলোকে পরিষ্কার করে লোহা এবং ইস্পাত তৈরী করা হয়।

বলতো ?—

১। খনির গভীরে যারা কাজ করে তারা কি করে খনির নীচে নামে ?

২। খনি থেকে যে কাঁচা লোহা বের করা হয় সেগুলো কোথায় এবং কিভাবে পাঠানো হয় ?

৩। খনির নীচে থেকে কাঁচা লোহা কি ভাবে ওপরে আনা হয় ?

খেলা-ধূলায়—

১। দিল্লীর কোন বড় বাড়ী, অফিস অথবা ষ্টেশনে গিয়ে লিফ্‌ট দেখ। তারপর লিফ্‌টে চড়ে ওপরে যাও, আবার নেমে এস।

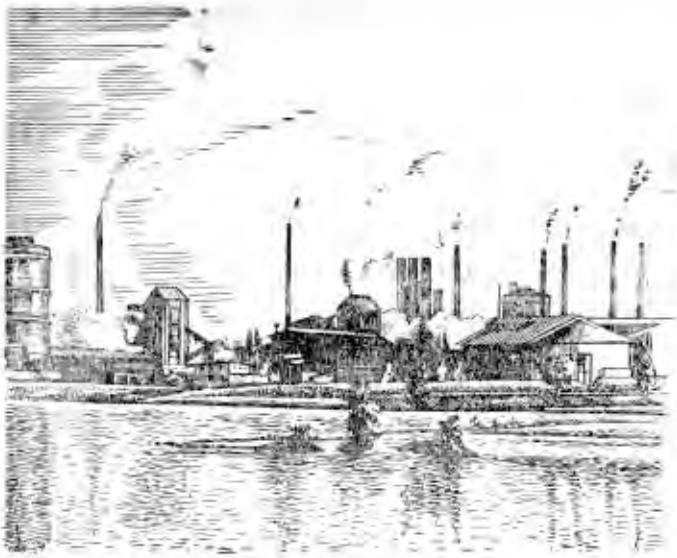

১১—জামসেদপুরের শিল্প শ্রমিক

শিক্ষক—জামসেদপুর, একটি প্রকাণ্ড শহর। আজ এই শহরটা দেখে কেউ কল্পনা করতে পারবেনা যে মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে এটা তৈরী হয়েছে। জামসেদজী টাটা এই শহরটা তৈরী করেছিলেন তাই তাঁর নাম অনুসারে শহরের নাম হয়েছে জামসেদপুর। এই শহরটা বিহার প্রদেশের অন্তর্গত। এখানে লৌহ এবং ইস্পাতের মস্ত বড় কারখানা আছে। উড়িষ্যার খনি থেকে যে সব কাঁচা লোহা তোলা হয় সেগুলো সবই প্রথমে ঐ কারখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। অবশ্য এখন লৌহ এবং ইস্পাতের আরও কয়েকটা কারখানা খোলা হয়েছে। জামসেদপুরের

কাছেই সিংহভূমি, মানভূমি ও ঝরিয়ার কয়লার খনি আছে। কারখানার কাজের জন্য সে সব জায়গা থেকেই কয়লা আনা হয়। লোহা এবং ইস্পাতের কারখানায় কয়লার খুবই দরকার হয় সেজন্য কয়লা খনির কাছেই এই সব কারখানা স্থাপিত হয়।

জামসেদপুরের রেল ষ্টেশনটাও প্রকাণ্ড বড়। কয়লা, কাঁচা লোহা, চুন ইত্যাদি রেলে বোঝাই করে এখানে নিয়ে আসা হয়। কারখানার সর্ব্বত্রই রেল লাইন আছে। জিনিষপত্র এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিতে হ'লে মালগাড়ীতে করে নিয়ে যাওয়া হয়। কারখানার সর্ব্বত্রই বৈদ্যুতিক আলোক ও টেলিফোনের ব্যবস্থা আছে। মোটকথা এই লোহার কারখানাটা এমন একটা বিরাট বিস্ময়কর ব্যাপার যে নিজের চোখে না দেখলে বোঝা যায় না।

লোহা আমরা যে ভাবে দেখতে পাই, খনিতে ঠিক সে ভাবে থাকে না—পাথর মাটি ইত্যাদির সঙ্গে মেশানো থাকে। পরে ঐগুলোকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিশুদ্ধ করে নেওয়া হয়। "লৌহ প্রস্তর" বা "আয়রন ওর" নামক এক প্রকার পাথর থেকেও টাটার কারখানায় লোহা প্রস্তুত হয়ে থাকে। জামসেদপুর থেকে কিছু দূরে গরুমহিষানী নামে একটা পাহাড় আছে। এই পাহাড় থেকে লোহার

জন্য পাথর কেটে আনা হয়। এই সব পাথরে বেশী পরিমাণে লোহা মেশানো থাকে। প্রায় চার হাজার লোক এই পাহাড়ে পাথর কাটার কাজে নিযুক্ত আছে। পাথর কাটা হলে রেলে বোঝাই করে কারখানায় নিয়ে আসা হয়।

তারপরে সেই পাথর থেকে সাধারণ লোহা প্রস্তুত হয়। সাধারণ লোহা প্রস্তুত করবার সময় তার সঙ্গে নানারকম রাসায়নিক জিনিষ একসঙ্গে মিশিয়ে ইলেকট্রিক্ ট্রলিতে ঢেলে দেওয়া হয়। এই ট্রলি ৮৫ ফুট উঁচু অগ্নিকুণ্ডের ফানেলের মুখে সেটা ঢেলে দেয়। একটু পরেই সেটা গলে গিয়ে সাদা পারদ স্রোতের মত লোহা বের হয়ে আসে। তখন এই গলিত লোহার কিছুটা জমান হয়—এই জমাট লোহাই সাধারণ লোহা। আর বাকী অংশটা ইস্পাত প্রস্তুতের জন্য ইস্পাত বিভাগে পাঠানো হয়ে থাকে। এইসব লোহা এবং ইস্পাত দিয়ে অসংখ্য জিনিষ এবং যন্ত্রপাতি তৈরী হয়। এই কারখানায় রেলের ইঞ্জিনও তৈরী হয়। প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক কারখানায় কাজ করে। শ্রমজীবিরা সর্ব্বদা আগুনের ধারে কাজ করে বলে তৃষ্ণার সময়ে তাদের বরফ এবং সোডা দেওয়া হয়। ঐ সময় জলপান করলে অসুখ হতে পারে বলে তাদের জল দেওয়া হয় না।

কারখানার পক্ষ থেকে এই সমস্ত শ্রমজীবিদের থাকবার জন্য ভাল ভাল বাড়ী, স্কুল, হাসপাতাল, সিনেমাহল, পার্ক

এবং খেলবার মাঠ ইত্যাদি তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ দিল্লীর মত বড় শহরের লোকরা যে সব সুখ সুবিধা ভোগ করছে এখানের শ্রমিকরাও সে সব সুবিধা ভোগ করছে।

এখানে যে কেবল আশেপাশের শহর বা গ্রামের লোকরাই কাজ করতে এসেছে তা নয় অনেক দূর দূর দেশ থেকেও মজুর শ্রমিক এবং ইঞ্জিনীয়াররা কাজ করতে এসেছে।

শহরের চারপাশে যে সব গ্রাম আছে সেখানের লোকরা কৃষিকার্য্য করে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। তারা তাদের জমিতে ধান, গম ইত্যাদির চাষ করে।

এখানের লোকরা দোল, দেওয়ালী ইত্যাদি উৎসব পালন করে থাকে। এদের ভাষা প্রধানতঃ হিন্দী।

অনুশীলনী

কি কি শিখলে—

১। জামসেদপুরে লৌহ এবং ইস্পাতের বড় কারখানা আছে।

২। প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে শ্রীজামসেদজী টাটা এই কারখানাটি স্থাপন করেন।

৩। জামসেদপুরের কারখানায় লোহার যন্ত্রপাতি ছাড়া রেলের ইঞ্জিনও প্রস্তুত হয়।

বলতো ?—

১। জামসেদপুর কোন প্রদেশে অবস্থিত ?

২। জামশেদপুরের কারখানার জন্য লোহা এবং কয়লা কোথা থেকে আসে ?

৩। জামসেদপুর কারখানার শ্রমিক সংখ্যা কত ?

খেলা ধূলায়—

১। ভারতবর্ষের মানচিত্রে দেখাও জামসেদপুর কোথায় ?

২। মানচিত্রে দেখাও লোহা এবং কয়লার খনি কোথায় কোথায় আছে ?

৩। তোমার বাড়ীতে লোহার তৈরী যে সমস্ত জিনিষ আছে তার একটা তালিকা প্রস্তুত কর।

১২—বোম্বাই বন্দরের কর্ম্মব্যস্ত ব্যবসায়ী

শিক্ষক—বোম্বাই ভারতবর্ষের তিনটি বড় শহরের অন্যতম। এই শহরটা ভারতবর্ষের পশ্চিমে সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। এছাড়া বোম্বাই ভারতবর্ষের একটি বড় বন্দরও। এখানে সমুদ্রগামী জাহাজ এসে নোঙ্গর করে। এই সব জাহাজে করে আমাদের দেশের অনেক জিনিসপত্র বিদেশে পাঠান হয় আবার বিদেশ থেকেও অনেক জিনিসপত্র আমাদের দেশে আসে। জিনিসপত্রের এই আনানেওয়াকে এক কথায় আমদানী রপ্তানী বলা হয়। বোম্বাই বন্দরে এই আমদানী রপ্তানী সবচেয়ে বেশী হয়। বন্দরে অনেক-গুলি বড় বড় ঘাটও তৈরী করা হয়েছে। এইসব ঘাটগুলি

থাকার ফলে এই সুবিধা হয়েছে যে জাহাজগুলি যতটা সম্ভব তীরের কাছাকাছি ভিড়তে পারে।

আমদানী রপ্তানীর জাহাজ ছাড়া অনেক যাত্রীবাহী জাহাজও এই বন্দরে আসে। লোকেরা এইসব জাহাজে করে এদেশ থেকে বিদেশে যায়, আবার বিদেশ থেকেও এদেশে আসে। যাত্রীরা প্রথমে জাহাজঘাটে নামে, তারপর সেখান থেকে নৌকায় করে তীরে আসে। ভারী ভারী মালপত্র জাহাজঘাটেই নামানো হয়।

বিদেশ থেকে মাল আমদানী রপ্তানীর কাজটা এই বন্দরে বেশী হয় বলে এখানে বড় বড় ব্যবসায়ীরা বাস করে।

বোম্বাই ভারতের বড় বাণিজ্য-কেন্দ্র। ব্যবসায়ীরা এখানে জিনিসপত্র বেচা কেনার কাজ করে। তারা এখান থেকে জিনিসপত্র কিনে নিয়ে অন্য জায়গার ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রী করে দেয়। এইভাবে ভারতের সব জায়গায় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পৌঁছে যায়।

এই ব্যবসা ভালভাবে চালানোর জন্য অফিস, ব্যাঙ্ক, রেল, মোটরগাড়ী, ডাক ও তারঘর, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। এই সব ভিন্ন ভিন্ন কাজে হাজার হাজার লোক নিযুক্ত আছে। এই ভাবে সকলেই তারা নিকটবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী অঞ্চলের লোকদের সেবা করে যাচ্ছে। ভারতের যেখানে যে জিনিসের প্রয়োজন হয় বোম্বাই-এর

ব্যবসায়ীরা সেখানে তা পৌঁছে দেয়। আবার যেখানে যে জিনিস প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়, এই সব ব্যবসায়ীরা সেখান থেকে সেগুলি কিনে নিয়ে অন্যত্র বিক্রী করে দেয়।

বোম্বাইএর লোকসংখ্যা প্রায় কয়েক লক্ষ। শহর-বাসীদের নিত্য প্রয়োজনীয় তরিতরকারী, দুধ ইত্যাদি সমস্ত জিনিষই নিকটবর্ত্তী অঞ্চল থেকে আসে। বোম্বাই শহরে কোন কৃষিযোগ্য ভূমি নেই এবং কৃষকেরাও এখানে থাকে না। শহরবাসীরা অবশ্য এর পরিবর্ত্তে তাদের অন্যান্য জিনিস দিয়ে সাহায্য করে থাকে। ঐ সব জিনিসের মধ্যে কাপড় ও যন্ত্রপাতিই প্রধান।

বোম্বাই এ পানীয় জল বাইরে থেকে সরবরাহ করা হয়। শহর থেকে দূরে পাহাড়ের ওপরে একটা বিদ্যুত-ঘর তৈরী করা হয়েছে, সেখান থেকে বোম্বাইএ বিদ্যুত ও আসে।

বোম্বাই এ ভারতবর্ষের সব প্রদেশের লোকরাই বাস করে—শুধু তাই নয় বহু বিদেশীও এখানে থাকে।

বোম্বাইকে 'ভারতবর্ষের দরজা' বলা হয়। কারণ বিদেশ থেকে লোকরা সাধারণতঃ এই পথেই ভারতে প্রবেশ করে।

বোম্বাইএ গুজরাটী ও মারাঠী এই দুই ভাষাতেই প্রধানতঃ কথাবার্ত্তা বলা হয়। তবে কাজ চালানোর মত হিন্দী প্রায় সকলেই জানে।

এখানে ব্যবসায়ীদের মধ্যে পার্শীরাই প্রধান। পার্শীরা খুব ধনবান এবং ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্ন হয়।

দোল, জন্মাষ্টমী, দেওয়ালী ইত্যাদি উৎসব তো আছেই, এছাড়া গণেশ উৎসব এখানকার একটি বিশেষ পর্ব্ব।

একথা তোমরা জান যে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকদের খাওয়াদাওয়া, চলাফেরা, কাজকর্ম্ম সবই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হয়, তবুও কয়েকটি বিষয়ে সব প্রদেশের লোকদেরই মিল আছে। সব লোকেরই মূল আবশ্যকতা এক। সকলেরই খাদ্য, বস্ত্র এবং গৃহের প্রয়োজন হয়। জীবনধারণের জন্য এসব জিনিস অপরিহার্য্য।

প্রত্যেক প্রদেশের লোকেরাই নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য অন্য প্রদেশের লোকদের ওপর নির্ভর করে, আর এইভাবে সব প্রদেশই একে অন্যকে সাহায্য করে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে আমরা সকলেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করি। কারণ আমরা সকলেই ভারতবর্ষের নাগরিক এবং ভারতবর্ষ আমাদের দেশ। নিজের দেশের সেবা করা দেশবাসীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

অনুশীলনী

কি কি শিখলে—

১। বোম্বাই সমুদ্রতীরে অবস্থিত একটি বড় বন্দর।

২। বোম্বাই ভারতের বাণিজ্য-কেন্দ্র।

৩। সমুদ্রগামী জাহাজের সাহায্যে ভারতবর্ষের জিনিসপত্র বিদেশে পাঠানো হয় এবং বিদেশী জিনিসপত্র ভারতে আনা হয়।

৪। বহু লোক সমুদ্রগামী জাহাজে করে বিদেশে যাত্রা করে।

বল তো?—

১। বোম্বাই শহরের লোকদের জন্য তরিতরকারী, দুধ ইত্যাদি কোথা থেকে আসে?

২। বোম্বাই এর ব্যবসায়ীরা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে জিনিসপত্র কি করে পৌঁছে দেয়?

৩। বোম্বাই এর প্রধান উৎসব কি?

৪। 'সব প্রদেশের লোকেদের মূল আবশ্যকতা এক'—একথার অর্থ বুঝাইয়া বল।

খেলাধূলায়—

১। জাহাজের ছবি আঁক।

১—(ক) জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়

(প্রাচীন যুগে)

শিক্ষক—অনেকদিন আগেকার কথা। আজ থেকে প্রায় লক্ষ বছর হবে। তখন গ্রাম বা শহর কোনটাই সৃষ্টি হয় নি। মানুষেরা সে সময় বনে জঙ্গলে বাস করতো। তাদের চেহারাও একেবারে বনমানুষের মত ছিল। তারা কাপড় চোপড়ের ব্যবহার একেবারেই জানত না। বাড়ী-ঘর তৈরী করতেও পারত না। কৃষিকার্য্য বা পশুপালন কোনটাই জানত না। তাদের নিজেদের অবস্থাই তখন পশুদের মত ছিল। এমন কি তারা আগুন পর্য্যন্ত জ্বালাতে জানতনা—বন জঙ্গলের কাঁচা ফলমূল খেয়েই তারা জীবন ধারণ করতো। বনমানুষ, বাঁদর এবং অন্যান্য বন্য জন্তুরা যে ভাবে জঙ্গলে থাকে প্রাচীন যুগের মানুষরাও ঠিক সেই ভাবেই জঙ্গলে বাস করতো। দিনের বেলা গাছে গাছে ফলের অন্বেষণে ঘুরে বেড়াত আর রাত্রিবেলা গাছের ডালে ঘুমাতো।

কি মানুষ কি পশুপক্ষী সকলের মধ্যেই আত্মরক্ষার একটা সহজাত বৃত্তি আছে। তাই বনের বাঘ সিংহ ইত্যাদি হিংস্র পশুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সে যুগের মানুষেরা লাঠি এবং পাথরের অস্ত্র তৈরী করতে

শিখেছিল। তারপর ধীরে ধীরে তাদের উন্নতি আরম্ভ হল। তারা জন্তু জানোয়ার বধ করে তার মাংস খেতে শিখল, তাদের হাড়ের সাহায্যে তীক্ষ্ণ অস্ত্র নির্ম্মাণ করতে শিখল।

ক্রমে ক্রমে তারা কথা বলতে ও আগুন জ্বালাতে শিখল এবং গুহার ভেতরে বাস করতে আরম্ভ করল। তারপর তাদের আরও উন্নতি হ'ল। পশুর মাংস তারা আগুনে ঝল্‌সে নিয়ে খেতে শুরু করল, লোহার সাহায্যে নানারকম অস্ত্র শস্ত্র তৈরী করতে শিখল এবং গরু, কুকুর ইত্যাদি পশু পালন করতে আরম্ভ

করল। এরপর তারা পশুর দুধ খেতে সুরু করল, জন্তু মেরে তার ছাল পরে লজ্জা নিবারণ করতে শিখল।

এইভাবে আরও হাজার হাজার বছর কেটে গেল, এদিকে মানুষের চাহিদাও ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগল। নিজেদের অসুবিধা তারা বুঝতে শিখল। যেদিন তাদের কোন শিকার মিলত না কিম্বা গাছের ফলমূল অথবা পশুর দুধও জুটতনা সেদিন তাদের খাওয়ার খুবই কষ্ট হতো। এই সব অসুবিধা দূর করবার জন্য তারা তখন কৃষিকার্য্য করতে আরম্ভ করল। নিজেদের ক্ষেতে তরী তরকারী হওয়াতে তাদের অনেকখানি সুবিধা হ'ল। সেই সময় তারা গুহা ছেড়ে কুঁড়ে ঘরে আশ্রয় নিল। কিন্তু তবুও তাদের চাহিদার শেষ হল না। নিত্য নতুন নতুন জিনিষ সৃষ্টি করবার কল্পনা তাদের মাথায় আসতে লাগল।

এদের মধ্যে কেউ কেউ মাটী দিয়ে নানারকম জিনিষ বাসনপত্র ইত্যাদি বানাতে আরম্ভ করে দিল। তাদের বলা হতো কুমোর। কেউ কেউ কাপড় বুনতে আরম্ভ করল—তারা তাঁতী নামে পরিচিত। আর যারা কৃষিকার্য্য নিয়ে রইল তাদের নাম দেওয়া হ'ল কৃষক। অর্থাৎ যার যেরকম পেশা তার সেরকম নাম। এই সব কাজ করে তারা যা রোজগার করতো তাই দিয়েই তারা নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণ করতো।

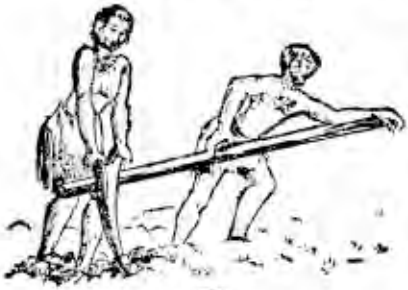

কুমোর, তাঁতী, কামার, মুচী, কৃষক এরা আমাদের বন্ধু। আজও আমরা এদের সাহায্য ছাড়া চলতে পারি না।

আজকালকার দিনেও কোন কোন লোক কাজ কর্ম্মের দিক দিয়ে পুরোনো রীতিকেই অনুসরণ করে আসছে। তাদের বাবা ও ঠাকুর্দ্দারা যে ভাবে কাজকর্ম্ম করে এসেছে তারাও সেই ভাবেই কাজকর্ম্ম চালাচ্ছে। আবার কোন কোন লোক সময় ও পরিশ্রম বাঁচাবার জন্য সেই একই কাজ নতুন পদ্ধতিতে নতুন নতুন যন্ত্রপাতির সাহায্যে করে যাচ্ছে।

প্রাচীন যুগে মানুষের প্রয়োজন খুব সামান্যই ছিল। এমন সময়ও ছিল যখন লোকেরা নিজেদের প্রয়োজনীয় সব রকম জিনিষ নিজেরাই তৈরী করে নিত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যখন তাদের প্রয়োজন আর অল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না, তখনই তাদের অন্যের সাহায্য নেবার দরকার হ'ল। আজকাল নিজের হাতে প্রয়োজন মেটাবার মত যাবতীয় কাজকর্ম্ম করা সত্যিই দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেইজন্য অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

অনুশীলনী

কি কি শিখলে?—

১। আজ থেকে লক্ষ বছর আগে আদিমানব বনে জঙ্গলে বনমানুষের মতই বাস করত। তারা উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াত, এবং তাদের কোন ঘরবাড়ী ছিল না।

২। আদিমানব ক্রমে ক্রমে নতুন নতুন ভাষা শিখল। ধীরে ধীরে তাদের আহার বিহার পোষাক পরিচ্ছদ সব কিছুর মধ্যেই বিরাট পরিবর্ত্তন এল।

৩। প্রাচীনকালে লোকের প্রয়োজনও খুব কম ছিল। বর্ত্তমান কালে লোকের প্রয়োজন যথেষ্ট বেড়ে গেছে। এই সমস্ত প্রয়োজন মেটাবার জন্য লোকদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়।

বলতো ?—

১। কেন আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিষ-পত্র নিজেরা তৈরী করতে পারি না ?

২। বর্ত্তমান যুগের লোকরা পুরানো পদ্ধতিতে কাজকর্ম্ম করে, না নতুন পদ্ধতিতে কাজকর্ম্ম করে ?

৩। প্রাচীনকালের মানুষ ও বর্ত্তমানকালের মানুষের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

খেলা ধূলায়—

১। তোমাদের লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে প্রাচীন মানুষদের বিষয়ে পড়।

২—(খ) জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়

(বর্ত্তমান যুগে)

শিক্ষক—প্রাচীন যুগের মানুষরা কী ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করতো সেটা তোমরা আগের পাঠে জেনেছ। এবার বর্ত্তমান যুগের মানুষরা কী উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করে সেটাও জেনে রাখ।

এটা তোমরা বেশ ভাল করেই জান যে যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আকৃতি প্রকৃতি, আচার ব্যবহার, বেশ-ভূষা, কাজকর্ম্ম সব কিছুরই পরিবর্ত্তন হয়েছে। মানুষের প্রয়োজন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের যেরকম নতুন নতুন কাজকর্ম্ম শিখতে হয়েছে সেরকম কাজকর্মের পদ্ধতিরও অনেক অদল বদল হয়েছে।

বন্য অবস্থায় মানুষ জঙ্গলের ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করতো। আজও সেই ফল খাওয়ার অভ্যাস তাদের ঠিকই আছে কিন্তু সেজন্য এখন আর কষ্ট করে বনে জঙ্গলে ফলের অন্বেষণে ঘুরে বেড়াতে হয় না। সভ্যমানব ফলের বাগান করে তাদের সেই অসুবিধা দূর করেছে।

এর আগে তোমরা পড়েছো যে কাশ্মীরের লোকেরা আপেল এবং অন্যান্য ফলের চাষ করে। তারা ফলগুলো

বাক্সবন্দী করে ট্রাক কিংবা রেলগাড়ীর সাহায্যে নানা জায়গায় পাঠিয়ে দেয়। এ ছাড়া তারা ফলের আচার, চাটনি মোরব্বা ইত্যাদি তৈরী করেও বিক্রী করে।

সুরেন—স্যার, ফলের দোকানে যতরকম ফল বিক্রী হয় সেগুলো সবই কি কাশ্মীর থেকে আসে ?

শিক্ষক—না। আপেল আসে কাশ্মীর আর কুল্লু থেকে। বোম্বাই থেকে আসে চিকু। নারকেল আসে দক্ষিণ ভারত থেকে আর কমলালেবু আসে নাগপুর থেকে। এইভাবে নানা জায়গা থেকে জিনিষপত্র শহরে আসে এবং লোকরা প্রয়োজন মত কেনে।

তোমরা অনেকেই হয়তো জুম্মা মস্‌জিদের কাছে মাছের বাজার দেখেছ। এই সমস্ত মাছ সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রদেশ, কেরালা ইত্যাদি জায়গা থেকে আসে। ওখানের লোকরা নিজেদের ছোট কিম্বা বড় নৌকোতে চড়ে সমুদ্রে গিয়ে মাছ ধরে।

এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠাবার সময় মাছ যাতে খারাপ না হয়ে যায় সেজন্য ওপরে নীচে বরফ দিয়ে তারপর পাঠান হয়। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার মাছ শুকিয়ে নিয়ে নুন মাখিয়ে কৌটোতে বন্ধ করে বিক্রী করে। কেরালার জেলেদের বিষয়ে তো তোমরা আগেই পড়েছ,—মাছ ধরেই তারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কোন

কোন লোক ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি পালন করে থাকে। অবশ্য প্রাচীন যুগের মানুষরাও এরকম পশুপালন করতো।

অশোক—জানি স্যার! রাজস্থানের লোকরা ভেড়া ছাগল ইত্যাদি পশু পালন করে থাকে।

শিক্ষক—হ্যাঁ—তারা ভেড়ার লোম থেকে পশম তৈরী করে বিক্রী করে! কিছু লোক আবার দুধের ব্যবসার জন্য গরু, মহিষ ইত্যাদি পালন করে। কেউ কেউ দুধ থেকে ক্রীম, মাখন ও ঘী তৈরী করে এবং সেগুলো বিক্রী করে পয়সা উপার্জ্জন করে। কেউ কেউ শুধু মাংসের

জন্যই পশু পালন করে। এই সমস্ত পশুর মাংস বরফ দিয়ে বাক্সে ভরে নানা স্থানে পাঠানো হয়ে থাকে।

কোন কোন লোক কৃষিকার্য্য করে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। হাজার বছর আগেও লোকেরা এ কাজ করতো।

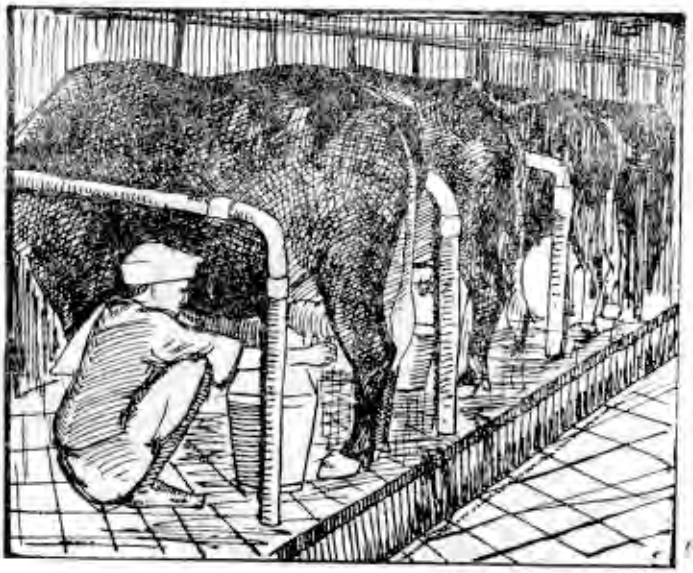

কিন্তু তখনকার কাজের সঙ্গে এখনকার কাজের অনেক পার্থক্য। এখন জমিকে কৃষিযোগ্য করবার জন্য অনেকেই ট্র্যাক্টর চালায়।

রমেন—হ্যাঁ, স্যার, আমি জানি। যাদের কাছে বড় বড় ক্ষেত আছে তারা ট্র্যাক্টর দিয়েই চাষ করে।

শিক্ষক—হ্যাঁ! ট্র্যাক্টরের সাহায্যে মাটী গভীর করে খোঁড়া যায়। তাছাড়া যে কাজ করতে আগে বেশী সময় লাগতো আজকাল সে কাজ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়।

কৃষকেরা গরু, মহিষ, বলদ, মুর্গী ইত্যাদিও পালন করে। তাছাড়া নানারকম ফল, তরিতরকারী ইত্যাদিরও চাষ করে।

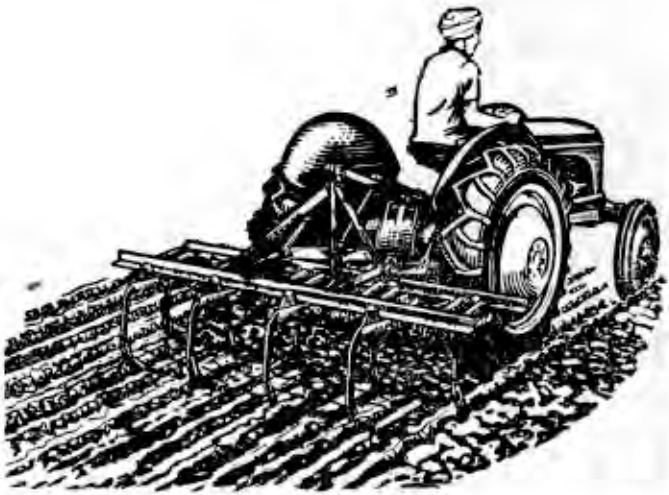

যেখানের জল সেচনের সুবিধা আছে সেখানে ফসল বেশী এবং ভাল হয়।

কৃষকেরা নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্য গাড়ী কিম্বা ট্রাকে বোঝাই করে শহরে বিক্রীর জন্য পাঠিয়ে দেয়। ফলে শহরের লোকেরা নিজেদের প্রয়োজন মত খাদ্যসামগ্রী পেয়ে যায়।

প্রাচীন যুগের মানুষরা যখন প্রথম কৃষিকার্য্য আরম্ভ করেছিল তখন তারা বনজঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে কৃষিযোগ্য ভূমি তৈরী করেছিল। সেই জঙ্গল কাটতে কাটতে এখন খুব সামান্যই অবশিষ্ট আছে। আজও ছাদের জন্য কড়িকাঠ, দরজা, খাট, টেবিল, চেয়ার, আলমারী ইত্যাদি আসবাবপত্র তৈরী করবার জন্য শাল, সেগুন, মেহগনি প্রভৃতি কাঠ জঙ্গল থেকেই আসে। সাধারণতঃ জঙ্গলে গাছপালা আপনা থেকেই হয়, কিন্তু যে সব গাছের কাঠ বেশী প্রয়োজনে লাগে সে সব গাছ লাগাতেও হয়। এই সমস্ত জঙ্গল দেখা শোনার জন্য কিছু লোক নিযুক্ত করা হয়। তাদের বলা হয় বনরক্ষক। তারা নতুন নতুন গাছ লাগায় ও পুরানো গাছগুলিকে জীবজন্তু পোকা মাকড় ইত্যাদির হাত থেকে রক্ষা করে। কখনও কখনও বনে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। তখন বনরক্ষকেরা নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করে হলেও আগুন নেবাতে সাহায্য করে। বাড়ী এবং আসবাবপত্র তৈরী করবার জন্য পুরানো গাছগুলি কেটে ফেলা হয়। এই সমস্ত কাঠ আবার জ্বালানীরূপেও ব্যবহৃত হয়।

কিছু লোক আবার খনিতেও কাজ করে।

প্রবীর—স্যার। উড়িষ্যার লোকরা খনিতে কাজ করে—তাই না?

শিক্ষক—হ্যাঁ! উড়িষ্যায় লোহার খনি আছে। এছাড়া অন্যান্য জায়গায় সোনা, রূপা, তামা, পিতল ইত্যাদিরও খনি আছে। খনিতে যারা কাজ করে তারা এই সমস্ত ধাতু মিশ্রিত মাটী ও পাথর খুঁড়ে বের করে। মাটী মিশ্রিত এই সব ধাতুকে কাঁচা ধাতু বলা হয়।

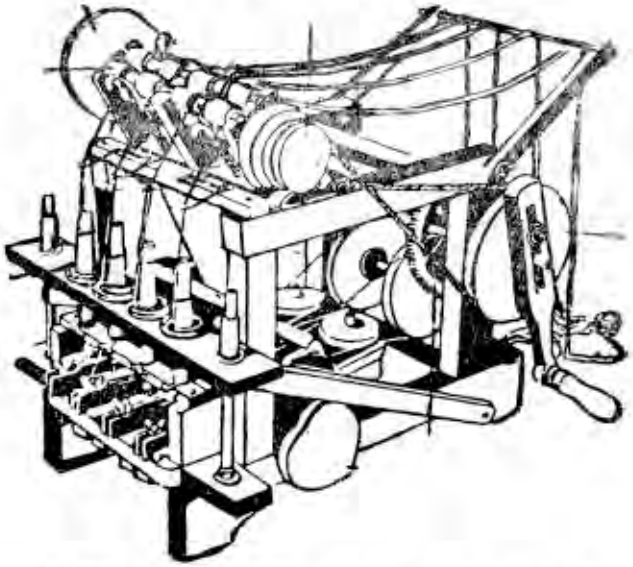

আজকাল অনেক লোক মিল এবং কারখানায় কাজ করে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। যন্ত্রের সাহায্যে কাজ করে বলে তারা অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কিছু জিনিষ তৈরী করে ফেলে। হাতের চেয়ে মেশিনে কাজ অনেক তাড়াতাড়ি হয়। তাই বলে লোকরা যে একেবারেই হাতের কাজ

করে না তা ভেবোনা ! এখনও অনেক লোক আছে যারা ছোট ছোট কারখানায় হস্তশিল্পের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে থাকে।

সমাজে বাস করতে গেলে নানারকম জিনিসের প্রয়োজন হয়। সেইজন্য লোকে নানারকম কাজকর্ম্ম করে থাকে। কিন্তু যে কোন কাজই দক্ষতার সঙ্গে করতে হলে শিক্ষার প্রয়োজন হয়। যে সে লোক ইচ্ছা করলেই কোন কাজ করতে পারে না। প্রত্যেক কাজই কারিগরদের আগে ভাল করে শিখে নিতে হয়। সমাজে সবরকম লোকেরই প্রয়োজন আছে। সমাজের পক্ষে কি ধোপা, কি মুচী— কি অধ্যাপক, কি ডাক্তার কারুরই প্রয়োজন উপেক্ষণীয় নয়।

অনুশীলনী

কি কি শিখলে ?—

১। হাজার হাজার বছর আগে লোকে যে সব কাজকর্ম্ম করতো, সেইসব কাজকর্ম্ম এখনও করা হয় তবে তার পদ্ধতি বদলে গেছে।

২। কৃষিকার্য্য, পশুপালন, শিকার ইত্যাদি কাজ আগেও হ'ত, এখনও হয়।

৩। মেশিনের সাহায্যে কাজ ভাল এবং তাড়াতাড়ি হয়।

৪। সমাজে সবরকম কাজেরই প্রয়োজন আছে। কোন কাজই ছোট নয়।

বল তো ?—

১। আপেল এবং কমলালেবু কোথায় হয় ?

২। কোন্ অঞ্চলের লোকরা মাছ ধরে জীবিকা অর্জ্জন করে ?

৩। ভেড়া কোন্ অঞ্চলের লোকরা পালন করে এবং কেন করে ?

৪। আমাদের প্রয়োজনীয় কাঠ আমরা কোথা থেকে পাই ?

৫। বড় হয়ে তুমি কি কাজ করতে চাও এবং কেন ?

খেলা ধূলায়—

১। তোমার এ্যালবামে কামার, কুমার, তাঁতী, ধোপা, মুচী, কৃষক, ডাক্তার ইত্যাদির ছবি লাগাও।

৩—দূরাঞ্চলের লোকরা আমাদের জন্য অনেক জিনিষ তৈরী করে

শিক্ষক—নরেন, এমন কতকগুলো জিনিষের নাম করতো যেগুলো বাড়ীতে আমাদের নিত্য প্রয়োজনে লাগে ?

নরেন—দুধ, চা, চিনি, কাপড়, জুতো, থলে, কাগজ, বাসনপত্র ইত্যাদি।

শিক্ষক—বাঃ! অনেক নাম করে ফেলেছ দেখছি। কিন্তু এটা তো তোমরা জানই যে এর মধ্যে খুব অল্প জিনিষই দিল্লীতে তৈরী হয়। বাকী জিনিষপত্র সবই দূর দূর অঞ্চল থেকে আসে। কোন জিনিষ আসাম থেকে আসে, কোন জিনিষ মাদ্রাজ থেকে আসে, কোন জিনিষ উত্তর-প্রদেশ থেকে আসে, কোন জিনিষ কেরল থেকে আসে আবার কোন জিনিষ বোম্বাই থেকে আসে। এইভাবে নানা জায়গা থেকে আমরা জিনিষপত্র পাই।

আমাদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিষ আমাদের আশে-পাশের অঞ্চলের লোকরা সরবরাহ করতে পারে না। দূর অঞ্চলের লোকদের ওপর আমাদের সেজন্য নির্ভর করতে হয়।

অরুণ—স্যার, আমাদের দিল্লীতে যে সব জিনিষ হয় সেগুলিও তো অন্য প্রদেশে পাঠানো হয় ?

শিক্ষক—নিশ্চয় হয়। আমরা সবাই একে অন্যকে সাহায্য করে থাকি। আমাদের যেমন অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হয়, অন্যেরও সেরকম আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

তোমরা সবাই দুধ খাও। জান কি এই দুধ কোথা থেকে আসে? দিল্লীরই আশেপাশের গ্রাম থেকে এই দুধ আসে। যে চা আমরা দোকান থেকে কিনি সেই চা আসাম প্রদেশে উৎপন্ন হয়। কফি আসে কর্ণাটক থেকে। চা, দুধ ও কফিতে যে চিনি মেশান হয় সেই চিনি কোথা থেকে আসে তা তোমরা জান কি?

বিজয়—চিনি উত্তর-প্রদেশ থেকে আসে স্যার।

শিক্ষক—হ্যাঁ! উত্তর-প্রদেশে সবচেয়ে বেশী চিনির কারখানা আছে। তাছাড়া পাঞ্জাব ও বিহারেও চিনির কয়েকটি কারখানা আছে।

তারপর কাপড়ের কথাই ধর। শীতের সময় আমরা পশম জাত কাপড় পরি, কম্বল গায়ে দিই। গরম কালে পাতলা সূতীর কাপড় ও রেশমী কাপড় পরি। এই সব কাপড় নানা জায়গায় তৈরী হয়। দিল্লীতে কাপড়ের মিল আছে। এছাড়া কানপুর, আমেদাবাদ, নাগপুর, বোম্বাই ও মান্দ্রাজে কাপড়ের অনেক বড় বড় কারখানা আছে। পাঞ্জাব, বোম্বাই ও মান্দ্রাজে অবশ্য তাঁতের কাপড়ও প্রস্তুত হয়।

গরম কাপড় ধারিয়াল (পাঞ্জাব), কানপুর ও বোম্বাই-এ প্রস্তুত হয়। কুল্লু ও কাশ্মীরে শাল, সিল্ক ও অন্য নানারকম কাপড় প্রস্তুত হয়। কাশ্মীর, বেনারস, মহীশূর ও আসাম রেশমী কাপড়ের জন্য বিখ্যাত।

চটের থলে, বস্তা ইত্যাদি বাংলা দেশ থেকে আসে। রাজস্থান, পাঞ্জাব, উত্তর-প্রদেশ ও মধ্য-প্রদেশে ভাল সতরঞ্চি প্রস্তুত হয়। নারকেলের দড়ি, চাটাই, পাপোষ ইত্যাদি কেরালা থেকে আসে।

চামড়ার জিনিষপত্র অর্থাৎ জুতো, থলে, সুটকেশ ইত্যাদি আগ্রা, কানপুর ও মান্দ্রাজে প্রস্তুত হয়।

অরুণ—আচ্ছা স্যার, আমাদের বই, খাতা ইত্যাদি কোথা থেকে আসে ?

শিক্ষক—বই আর খাতা তো দিল্লীতেও হয়। কিন্তু তার জন্য যে কাগজের প্রয়োজন হয় সেই কাগজ আসে বাংলাদেশ (টিটাগড়) ও বোম্বাই থেকে। আচ্ছা, অশোক তুমি বল তো সবচেয়ে বড় লোহার কারখানা কোথায় আছে ?

অশোক—স্যার, জামসেদপুরে টাটার লোহা ও ইস্পাতের কারখানাই সবচেয়ে বড়।

শিক্ষক—ঠিক বলেছ ! লোহা ও ইস্পাতের অনেক জিনিষই সেখান থেকে আসে। পেতলের বাসনপত্র মোরাদাবাদ (উত্তর-প্রদেশ), বোম্বাই ও রাজস্থানের কোন

কোন জায়গায় তৈরী হয়। কাঁচের ও চীনামাটির জিনিষ কলকাতা, গোয়ালিয়র এবং উত্তর-প্রদেশে তৈরী হয়।

এর থেকে তোমরা বুঝতে পারছ যে আমাদের বাড়ীতে প্রায় সব প্রদেশেরই তৈরী কিছু না কিছু জিনিষ রয়েছে। প্রত্যেক প্রদেশের লোকরাই আমাদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য কিছু না কিছু জিনিষ প্রস্তুত করে থাকে।

এখন এই সমস্ত জিনিষ কি করে শেষ পর্য্যন্ত আমাদের হাতে এসে পৌঁছয় সে সম্বন্ধে তোমাদের বলছি শোন। প্রথমে বড় বড় ব্যবসায়ীরা যে যে জায়গায় যে যে জিনিষ তৈরী হয় সেগুলো সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে কিনে

নেয়। তারপর ঐ সমস্ত জিনিষ রেলগাড়ী ও ট্রাকে বোঝাই করে নিয়ে এসে নিজেদের গুদামে রেখে দেয়। সেখান থেকে আবার প্রত্যেক শহরের ছোটখাটো ব্যবসায়ী কিম্বা দোকানদাররা সেগুলো কিনে নিয়ে যায়। তাদের মধ্যে আমাদের এই শহরের ব্যবসায়ী আর দোকানদারও থাকে।

যখন আমাদের কোন কিছুর প্রয়োজন হয় তখন আমরা ঐ দোকানদারদের কাছ থেকেই সেগুলো কিনে নিই। এই-ভাবে দূরদূরান্তর থেকে জিনিষপত্র আমাদের কাছে এসে পৌছয়।

এখন তোমরা নিশ্চয় ভাল করে বুঝতে পেরেছ যে আমাদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিষপত্র কেবল আমাদেরই শহরে বা আশেপাশের গ্রামেই তৈরী হয় না—দূর দূর অঞ্চল থেকেও আসে। এইভাবে ভারতবর্ষের সব প্রদেশের লোকরাই আমাদের সাহায্য করে থাকে।

অনুশীলনী

কি কি শিখলে ?—

১। আমাদের শহরে বা আশেপাশে যা যা জিনিষ তৈরী হয় তা দিয়ে আমাদের সব প্রয়োজন মেটে না।

২। ভারতবর্ষের সব প্রদেশের লোকরাই আমাদের প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করে থাকে।

৩। ভারতবর্ষের প্রত্যেক অঞ্চলের লোকরাই পরস্পরকে সাহায্য করে।

বল তো ?—

১। 'চা' এর পেয়ালায় চা, দুধ, চিনি ও জল থাকে। বল তো এই সমস্ত জিনিষ কোন্ কোন্ জায়গা থেকে আসে ?

২। তোমরা যে পশমী, সুতী ও রেশমী কাপড় ব্যবহার কর সেগুলো কোথায় কোথায় তৈরী হয় ?

৩। জুতো, চামড়ার ব্যাগ, সুটকেশ ইত্যাদি কোথায় প্রস্তুত হয় ?

৪। কি করে দূর দূর অঞ্চল থেকে এই সমস্ত জিনিষ আমাদের হাতে এসে পৌঁছয় ?

খেলা ধূলায়—

১। তোমাদের ঘরে যা যা জিনিষ আছে তার একটা তালিকা প্রস্তুত কর আর জানতে চেষ্টা কর ঐগুলি কোন্ কোন্ জায়গা থেকে এসেছে ?

২। তোমার বাবার সঙ্গে দোকানে গিয়ে দেখ—সেখানে কি কি জিনিষ আছে।

৩। তোমার এ্যালবামে কারখানা, মিল এবং ফ্যাক্টরীর ছবি লাগাও। খবরের কাগজে এই সব ছবি পাবে।

৪—কাপড়ের কাহিনী

শিক্ষক—আজ তোমাদের আমি কাপড়ের সম্বন্ধে বলবো। তোমরা বোধ হয় জান যে খাদ্যের পরই মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে বস্ত্র। আচ্ছা দীপক বলতো শীতের সময় তুমি কি রকম কাপড় পর ?

দীপক—শীতের সময় আমি গরম কাপড় পরি, স্যার। যেমন—কোট, সোয়েটার, মোজা ইত্যাদি। সার্ট পাজামা অবশ্য সূতারই পরে থাকি।

শিক্ষক—সুরেন, এবার তুমি বল তো গরমের সময় তুমি কিরকম কাপড় পর ?

সুরেন—আমি গরমের সময় পাতলা সূতীর কাপড় পরি।

শিক্ষক—ঠিক বলেছ! এর থেকে তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছ যে ঋতুপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পোষাক পরিচ্ছদেরও পরিবর্ত্তন হয়। শীতের সময় পশমজাত এবং মোটা সূতোর কাপড় পরতে হয়। তাছাড়া শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্য কাপড়চোপড়ও তখন বেশী পরতে হয়।

গরমের সময় আমরা হাল্‌কা সূতোর কাপড় পরি। এছাড়া রেশমী কাপড়ও ব্যবহার করে থাকি।

খাদ্যের পরে বস্ত্রই আমাদের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু। শীত গ্রীষ্মের হাত থেকে বস্ত্রই আমাদের রক্ষা করে। বস্ত্রের দ্বারা দেহের সৌন্দর্য্যও বৃদ্ধি পায়।

আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগেও বস্ত্রের প্রচলন ছিল কিন্তু তখনকার সঙ্গে এখনকার বস্ত্রের অনেক প্রভেদ।

অরুণ—অনেক দিন আগে তো মানুষ উলঙ্গ থাকতো। তারা কাপড় তৈরী করতেই জানতো না।

শিক্ষক—হ্যাঁ! সেটা ঠিক কথা। লক্ষ বছর আগে বন্যমানুষেরা কাপড় তৈরী করতে জানতো না। তারা গাছের ছাল বড় বড় পাতা এবং ঘাস ইত্যাদির সাহায্যে নিজেদের শরীর ঢেকে রাখতো। তারপর যখন তারা শিকার করতে শিখল তখন পশু মেরে তার ছাল পরতে লাগলো। অনেকদিন পরে তারা পশুর লোমের সাহায্যে কাপড় প্রস্তুত করতে আরম্ভ করলো, আর এই ভাবেই ক্রমে ক্রমে ভেড়ার লোম থেকে পশম এবং সেই পশম থেকে কাপড়ের উৎপত্তি হলো। আবার কোন অঞ্চলের লোকরা রেশম কীটরা যে গুটি তৈরী করে তার থেকে সূতো বের করে কাপড় তৈরী করতে আরম্ভ করলো। এই ভাবে রেশমী কাপড়ের জন্ম হলো।

ক্রমে ক্রমে বন্যমানুষরা যখন সভ্য হ'লো এবং কৃষিকার্য্য করতে লাগল তখন তারা কার্পাস বুনতে সুরু করল।

কার্পাসের তুলো থেকে সুতো হয় একথা তোমরা জান বোধ হয়। সেই সুতো দিয়ে তখন কাপড় বোনা আরম্ভ হ'লো। সুতোর কাপড় পেয়ে লোকদের খুসীর আর সীমা রইল না।

আজকাল আমরা যে সব কাপড় ব্যবহার করি সেগুলো প্রায় সবই বড় বড় কারখানায় মেশিনের সাহায্যে প্রস্তুত করা হয়। এই সব কারখানায় সূতী, রেশমী এবং গরম সবরকম কাপড়ই প্রস্তুত হয়।

সূতীর কাপড় কার্পাস থেকে তৈরী হয়। কার্পাসের জন্ম হয় ক্ষেতে। কৃষকেরা কার্পাসের চাষ করে। রেশম কীট থেকে আসল রেশম পাওয়া যায়। কাশ্মীর, মহীশূর ও আসামে বহু লোক রেশম কীটের চাষ করে।

ভেড়ার লোম থেকে পশম পাওয়া যায়। সেইজন্য অনেকে ভেড়া পালন করে। তারা পশম তৈরী করে বিক্রী করে। এটাই তাদের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়। রাজস্থান, কাশ্মীর এবং হিমাচল প্রদেশের অনেক লোকই ভেড়া পালন করে থাকে।

পার্থ—স্যার, নাইলনের কাপড় তো খুব মিহি হয়। নাইলন একরকম রেশমী কাপড়, না?

শিক্ষক—না। নাইলন আর রেশম সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ। কাঠের মণ্ড থেকে নাইলন প্রস্তুত হয়। সেই-রকম দোকানে যে নানারকম রংবেরংএর রেশমী কাপড়

পাওয়া যায় সেগুলিও আসল রেশম সিল্ক নয়—নকল রেশম। ঐগুলিকে রেয়ন সিল্কও বলা হয়। এই সমস্ত কাপড়ও কাঠের মণ্ড থেকে তৈরী হয়। কানপুর, আমেদাবাদ, নাগপুর, বোম্বাই এবং মান্দ্রাজে কাপড়ের কারখানা আছে। এক একটা কারখানায় শত শত লোক কাজ করে। তারা প্রতিদিন হাজার হাজার গজ কাপড় প্রস্তুত করে। তুলো ধোনা, সুতো কাটা, বোনা, এবং রং করা এ সমস্ত কাজই মেশিনের সাহায্যে শীঘ্র এবং ভালভাবে সম্পন্ন হয়।

তোমরা এর আগের পাঠেই জেনেছ যে বড় বড় ব্যবসায়ীরা এই সব কারখানা থেকে কাপড় কিনে নিয়ে ছোট ছোট ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের কাছে বিক্রী করে দেয়। তারপর লোকরা দোকান থেকে নিজেদের ইচ্ছেমত কাপড় কিনে আনে।

একশ বছরও পূর্ণ হয়নি আমাদের দেশে এইসব কাপড়ের কারখানা স্থাপিত হয়েছে। তার আগে সমগ্র দেশে তাঁতীরা তাঁতেই কাপড় বুনতো। এখনও গ্রামাঞ্চলে তাঁতীরা হাতেই কাপড় বোনে। বর্ত্তমানে তাঁতেও বেশ ভাল ভাল কাপড় তৈরী হচ্ছে। এমন অনেক লোক আছে যারা তাঁতের কাপড়ই বেশী পছন্দ করে। আবার অনেকে আছে যারা খদ্দর পরতে ভালবাসে। মোট কথা সকলেই নিজের নিজের রুচি অনুযায়ী কাপড় পরে থাকে।

অনুশীলনী

কি কি শিখলে—

১। খাদ্যের পরে বস্ত্রই মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু।

২। ঋতু অনুসারে আমরা কাপড় চোপড় পরে থাকি। শীতকালে গরম এবং গ্রীষ্মকালে হাল্‌কা সূতোর অথবা রেশমী কাপড় ব্যবহার করি।

৩। শীত গ্রীষ্মের হাত থেকে কাপড় আমাদের রক্ষা করে এবং দেহকে সুন্দররূপে সাজাতে সাহায্য করে।

৪। আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে মানুষেরা গাছের ছাল, পাতা, ঘাস এবং পশুর চামড়া দিয়ে শরীর ঢেকে রাখতো। তারপর ভাল ভাল কাপড় তৈরী করা শিখবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পোষাক পরিচ্ছদেরও পরিবর্ত্তন হ'লো।

৫। আজকাল অনেক কাপড়ই মেশিনে প্রস্তুত হয়।

৬। কার্পাস ক্ষেতে উৎপন্ন হয়, পশম ভেড়ার লোম থেকে পাওয়া যায়, আসল রেশম পোকারা তৈরী করে। কৃত্রিম রেশম কাঠের মণ্ড ইত্যাদি থেকে প্রস্তুত হয়।

বলতো ?—

১। রেশম কীটের চাষ কোথায় কোথায় হয় ?

২। ভারতবর্ষে কাপড়ের কারখানা কোথায় কোথায় আছে ?

৩। কারখানা থেকে দোকানদারের কাছে কাপড় কি ভাবে আসে ?

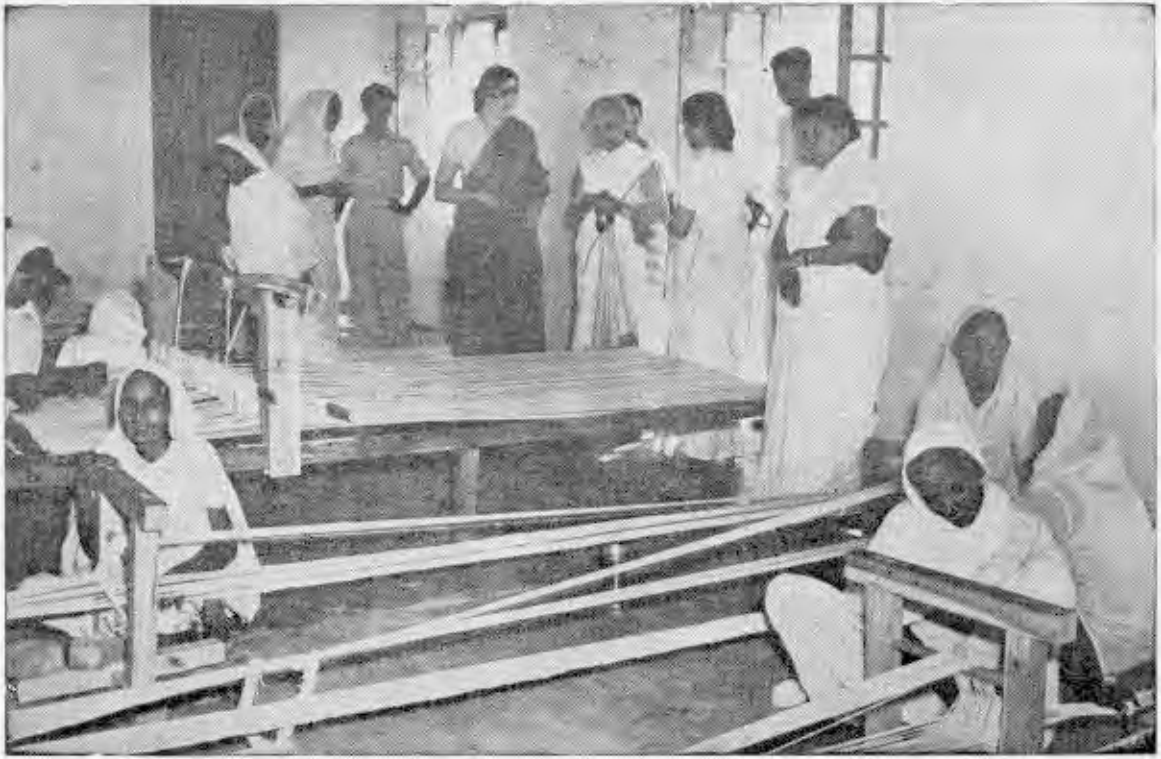

৪। যখন কারখানা ছিল না তখন কি ভাবে কাপড় তৈরী হতো?

খেলা-ধূলায়—

১। রংবেরংএর কাপড়ের নমুনা একত্র কর। তারমধ্যে সূতী, পশমী ও রেশমী সব রকমই থাকা চাই।

২। কার্পাস গাছ, ভেড়া এবং রেশম কীটের ছবি যোগাড় করে এ্যালবামে লাগাও।

১—ডাকঘর ও তারঘর আমাদের জন্য কি কি কাজ করে ?

শিক্ষক—অরুণ, বল তো ঐ যে খাকী পোষাক পরা, কাঁধে ব্যাগ ঝোলানো লোকটি আস্‌ছে সে কে ?

অরুণ—পিয়ন, স্যার ! লোকের বাড়ী বাড়ী চিঠি দিয়ে বেড়ায়।

শিক্ষক—পিয়ন এই সব চিঠিপত্র কোথা থেকে নিয়ে আসে তা তোমরা জান কি ?

প্রশান্ত—জানি স্যার। পিয়নরা সমস্ত চিঠিপত্র ডাক-খানা থেকে নিয়ে আসে।

শিক্ষক—ঠিক বলেছ। আজ আমি তোমাদের এই ডাকঘর ও তারঘরের গল্প শোনাব।

একথা তোমরা সকলেই জান যে, আমরা আমাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের কাছে চিঠিপত্র লিখে থাকি—আবার তাদের কাছ থেকে ঐ সমস্ত চিঠির উত্তরও যথা-সময়ে পাই। কিন্তু আজ থেকে সোয়া'শ বছর পূর্ব্বে আমাদের সে সুবিধা ছিল না।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের আমলে ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অন্য-রকমের ছিল। তাঁরা চিঠিপত্র খুব কমই লিখতেন। সেই সময় ঘোড়ায় চড়ে, উটের পিঠে চড়ে অথবা পায়ে হেঁটে ডাকহরকরারা এক জায়গার চিঠি আর এক জায়গায় পৌঁছে দিত। রাস্তায়ই তাদের অনেকদিন কেটে যেতো। তাছাড়া নানা বাধাবিপত্তি তো ছিলই। রাস্তায় কখনও তাদের জঙ্গল, কখনও পাহাড়, কখনও নদী-নালা কখনও বা মরুভূমি পার হওয়ার প্রয়োজন হ'তো! এই সমস্ত কারণে চিঠি পৌঁছতেও অনেক দেরী হতো। কখনও কখনও কয়েক মাস কেটে গেলেও চিঠি পাওয়া যেতো না। তাছাড়া চিঠি অবশ্যই পাওয়া যাবে কিনা তারও কোন নিশ্চয়তা ছিল না। আর যদিই বা কোনরকমে সে চিঠি পৌঁছতো তবুও তার জবাব আসবে কিনা বা কবে আসবে সে বিষয়েও কিছু ঠিক ছিল না।

কিন্তু বর্ত্তমান যুগের কথা সম্পূর্ণ আলাদা। আজকাল চিঠি লিখতে গেলে খুব কম খরচেই সারা যায়। পোষ্ট-কার্ডের দাম মাত্র ছয় নয়া পয়সা আর খামের দাম পনের নয়া পয়সা। কাজেই মাত্র ছয় নয়া পয়সার কার্ডে তোমরা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই চিঠি লিখতে পার—সে জায়গা যদি এখান থেকে হাজার মাইল দূরেও হয় তবুও।

আজকালকার মানুষ নানা প্রয়োজনে চিঠিপত্র লিখে থাকে। কেউ কোন খবর পাঠাবার জন্য, কেউ আত্মীয়-স্বজনের কুশল জানবার জন্য, কেউ বা কোন জিনিস আনাবার জন্য চিঠি আদানপ্রদান করে।

অনেকে ডাকখানা মারফৎ টাকাও পাঠিয়ে থাকে। তাকে 'মনি-অর্ডার' বলা হয়।

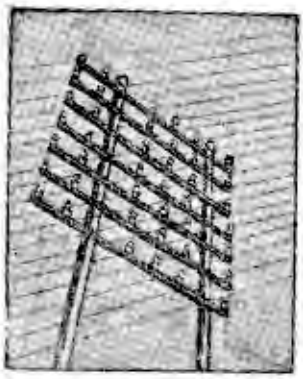

কোন সময় হয়তো আমাদের কোন খবর খুব তাড়াতাড়ি পাঠাবার দরকার হয়। আমরা চাই যে সে খবর যেন সেদিনই, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যায়। তখন আমরা তারের সাহায্য নিই। ডাক ও তার-ঘর এ বিষয়ে আমাদের যাহায্য করে। শহরের অনেক ডাকঘরেই তার বা টেলিগ্রাম

পাঠাবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু গ্রামে ছোটখাটো ডাকখানায় সেরকম কোন সুবিধা নেই।

সুব্রত—তা হ'লে গ্রামের লোকেরা কি ভাবে তারে খবর পাঠায়?

শিক্ষক—টেলিগ্রাম পাঠাবার দরকার হলে গ্রামবাসীরা নিকটবর্ত্তী শহরের ডাকখানা থেকে পাঠায়। টেলিগ্রামে কিন্তু বেশী কথা লেখা যায় না। খুব সংক্ষেপে লিখতে হয়। টেলিগ্রামে লেখা শব্দের সংখ্যা অনুযায়ী পয়সা দিতে হয়।

শহরগুলিতে এ ছাড়া আর একটি সুবিধা আছে। সেটা হচ্ছে টেলিফোন। টেলিফোনের সাহায্যে আমরা যখন যেখানে খুসী—কাছের বা দূরের লোকেদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে পারি।

অনেক লোকের বাড়ীতে, অফিসে, স্কুল-কলেজে এবং বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলিতে টেলিফোন থাকে। প্রত্যেক টেলিফোনেরই আলাদা আলাদা নম্বর আছে। তোমরা টেলিফোন নিশ্চয় সবাই দেখেছ? টেলিফোনে এক থেকে নয় পর্য্যন্ত সংখ্যা লেখা থাকে। শূন্যও থাকে। যার কাছে টেলিফোন করতে হবে প্রথমে তার টেলিফোনের নম্বর কত সেটা জানতে হবে। তারপর টেলিফোনের ডায়াল ঘুরিয়ে সেই নম্বরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। যেখানে

টেলিফোন করা হচ্ছে সেখানে যখন ক্রিং ক্রিং করে ঘণ্টা বাজতে থাকে তখনই সেখানের লোকরা বুঝে নেয় যে তাদের টেলিফোন এসেছে। তখন তারা রিসিভার উঠিয়ে কানে লাগায়। রিসিভারের একদিক কানের কাছে ধরতে হয় ও

অন্য দিক মুখের কাছে ধরতে হয়। কান দিয়ে কথা শুনতে হয় আর মুখ দিয়ে বলতে হয়। এইভাবে টেলিফোনে কথাবার্তা হয়ে থাকে।

এইভাবে ডাক-তার ও টেলিফোন আমাদের অনেক উপকার করে। এরা আমাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ বজায় রাখতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই ডাকঘর ও তারঘর খোলা হয়েছে। শহরে টেলিফোনের ব্যবস্থা আছে। এগুলির সাহায্যে লোকদের পরস্পারের সংবাদ আদান প্রদান, টাকা পাঠান এবং এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় তাড়াতাড়ি

খবর পাঠাবার খুব সুবিধা হয়েছে। তা ছাড়া ডাকখানা মারফৎ বই, ওষুধ ও অন্যান্য ছোটখাটো জিনিসও এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠানো হয়। এই সব জিনিষগুলিকে পার্শেল করে পাঠাতে হয়। ডাকখানায় ইচ্ছা করলে লোকরা টাকা পয়সাও জমা রাখতে পারে।

অনুশীলনী

কি কি শিখলে ?—

১। ডাক-তার ও টেলিফোন লোকদের পরস্পরের সম্বন্ধ বজায় রাখতে এবং খবরাখবর আদান প্রদান করতে খুবই সাহায্য করে।

২। আজ থেকে দু'শ বছর আগে লোকেরা চিঠিপত্র খুব কমই লিখতো। সে সময় ডাক আনা নেওয়ার কোনরকম সু-ব্যবস্থা ছিল না। চিঠি পাঠাতে গেলে খরচও অনেক বেশী পড়তো।

৩। ডাকখানা মারফৎ বই, ওষুধ ও অন্যান্য ছোটখাটো জিনিষের পার্শেল পাঠানো যায়।

৪। আজকাল আমরা নামমাত্র খরচেই হাজার হাজার মাইল দূর পর্য্যন্ত খবর পাঠাতে পারি।

বল তো ?—

১। চিঠিপত্র পৌঁছানো ছাড়া ডাকঘর আর কি কি কাজ করে ?

২। দূরের লোকদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে হলে আমরা কিসের সাহায্যে বলতে পারি ?

৩। কোন খবর তাড়াতাড়ি পাঠাবার প্রয়োজন হলে কি করে পাঠানো যায় ?

খেলাধূলায়—

১। ডাকঘর থেকে মনি-অর্ডারের ফর্ম চেয়ে নিয়ে ভরতে শেখা।

২। বাড়ীতে যে সব চিঠিপত্র আসে তার থেকে টিকিট খুলে নিয়ে এ্যালবামে আট্‌কাও।

৩। টেলিফোনে কোন বন্ধুর সঙ্গে কথা বল।

২—রেলযাত্রা সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য

শিক্ষক—রমেন বলতো এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে হলে তোমরা কিসের সাহায্যে যেতে পার ?

রমেন—মোটর, বাস, কিম্বা রেলগাড়ীর সাহায্যে আমরা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে পারি।

শিক্ষক—হ্যাঁ ! প্রত্যেক লোকেরই কোন না কোন কার্য্যবশতঃ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার দরকার হয়। কখনও আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে, কখনও কারুর বিয়েতে, কখনও তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে, কখনও বা সুন্দর সুন্দর জায়গায় বেড়াবার উদ্দেশ্যে লোকেরা যাতায়াত করে থাকে। ব্যবসায়ীরা জিনিষপত্র কিনবার জন্য যাত্রা করে। গ্রামের লোকেরা চাকরী পাওয়ার আশায় শহরে আসে। এইভাবে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাতায়াত করবার জন্য লোকেরা নানারকম যানবাহনের সাহায্য নিয়ে থাকে। কেউ কেউ বাসে বা মোটরে করে যাতায়াত করে। কিন্তু অনেক দূরের রাস্তা হ'লে বাসে বা মোটরে সুবিধা হয় না। কারণ তাতে খরচ তো বেশী হয়ই, উপরন্তু সময়ও অনেক বেশী লাগে। কোন কোন লোক উড়ো জাহাজে চড়েও এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যায়।

কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়—তার কারণ উড়োজাহাজের ভাড়া অত্যন্ত বেশী। সেইজন্য দূরে যাতায়াতের পক্ষে রেলগাড়ীই সবচেয়ে ভাল।

রেলগাড়ী আবিষ্কার হওয়ার ফলে লোকের যাতায়াতের অনেক সুবিধা হয়েছে। আগে যেখানে যেতে লোকের

একমাস সময় লাগতো আজকাল সেখানে আমরা একদিনেই পৌঁছে যাই, আর আগে যেখানে যেতে কয়েকদিন লাগতো সেখানে আজকাল কয়েকঘণ্টার মধ্যেই উপস্থিত হওয়া যায়।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা পায়ে হেঁটে গরুর গাড়ী করে অথবা ঘোড়া কি উটের পিঠে চড়ে যাতায়াত করতো।

পথে যদি কোন জঙ্গল পড়তো বা নদী পার হবার দরকার পড়তো তবে তাদের খুবই অসুবিধায় পড়তে হ'তো। আর মরুভূমি পার হবার সময় তো মাইলের পর মাইল তাদের জলই মিলত না। কখনও কখনও ভারবাহী পশুরাও ক্লান্ত এবং অসুস্থ হয়ে পড়তো। কখনও বা চোর ডাকাতরা যাত্রীদের সর্ব্বস্ব লুঠ করে নিত। অর্থাৎ প্রতি পদে পদেই তখন বিপদের আশঙ্কা ছিল। কিন্তু রেলগাড়ী আমাদের সব অসুবিধাই দূর করে দিয়েছে। রেলে চড়ে মানুষ দু একদিনের মধ্যেই দেশের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্তে অনায়াসে পৌঁছে যেতে পারে।

রেল দিবারাত্রই চলে। রেলের কখনও বিরাম নেই। প্রতিদিনই লক্ষ লক্ষ যাত্রী তাদের লক্ষ লক্ষ মন বোঝা নিয়ে রেলে চড়ে এখানে ওখানে যাতায়াত করে।

কল্যাণ—স্যার, আমিও গরমের ছুটীতে রেলে চড়ে কলকাতায় গিয়েছিলাম।

শিক্ষক—বেশ, তাহ'লে বলতো রেলের টিকিট কোথা থেকে কিনতে হয়?

কল্যাণ—তা তো জানি না স্যার, বাবা কোথা থেকে যেন কিনে এনেছিলেন!

শিক্ষক—বাঃ! তা বললে কি হয়? রেলে চড়ে কোথাও যেতে হলে কি ভাবে সব খোঁজখবর নিয়ে যাওয়ার

ব্যবস্থা করবে সেটাও তো জানা দরকার। আজ আমি তোমাদের সে কথাই বলছি শোন। রেলে করে কোথাও যেতে হলে নির্দ্ধারিত সময়ের কিছু পূর্ব্বেই ষ্টেশনে পৌঁছানো উচিত। ষ্টেশনে পৌঁছে যেখানে যাওয়ার কথা সেখানকার টিকিট প্রথমে কেনা দরকার। টিকিট বিক্রীর জন্য টিকিটঘরে অনেকগুলি জানালা থাকে। টিকিট কিনবার সময়

লাইন করে দাঁড়াতে হয়। টিকিট কেনা হয়ে গেলে ষ্টেশনের ভেতরে প্রবেশ করা যায়। ষ্টেশনে অনেক 'প্ল্যাটফর্ম' থাকে। ষ্টেশনের ভেতরে গাড়ী যে যায়গায় এসে দাঁড়ায় তাকে প্ল্যাটফর্ম বলা হয়। প্রত্যেক প্ল্যাটফর্মেরই ১,২,৩ করে আলাদা নম্বর থাকে টিকিটঘরের কাছেই 'এন্‌কোয়ারী' আলাদা

অফিস থাকে। সেখানে ষ্টেশন বা গাড়ী সংক্রান্ত সবরকম খোঁজখবরই নেওয়া যায়। সেখানে তুমি জিজ্ঞেস করতে পার যে অমুক জায়গার গাড়ী কখন এবং কত নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে। এই বিভাগের কর্মচারীরা রেলযাত্রীদের খুবই সাহায্য করে থাকে। যাত্রা সম্বন্ধে তোমার যা কিছু জানবার

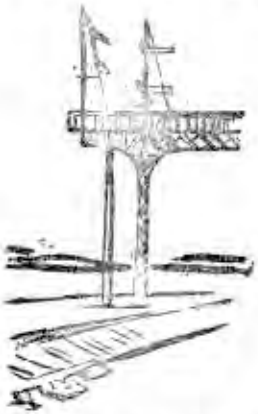

আছে তুমি অনায়াসেই এখানে প্রশ্ন করে সেগুলি জেনে নিতে পার। গাড়ী কখন আসবে বা ছাড়বে, ভাড়া কত, কখন গিয়ে গন্তব্যস্থানে পৌঁছবে এ সবই এরা তোমাকে বলে দেবে।

এই অফিস থেকে প্ল্যাটফর্মের নম্বর জেনে নিয়ে সেখানে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করতে হবে। গাড়ী আসবার সময় হলে সিগ্‌ন্যাল নীচু হয়ে যায়। সিগ্‌ন্যাল একটা উঁচু স্তম্ভের সঙ্গে লাগানো থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সিগ্‌ন্যাল নীচু না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন গাড়ী অগ্রসর হতে পারে

না। গাড়ী আসবার আগে ঘণ্টা বাজানো হয়। ঘণ্টা বাজিয়ে সবাইকে সতর্ক করে দেওয়া হয় যে এবার গাড়ী আসছে। যাত্রীরা সবাই তখন গাড়ীতে উঠবার জন্য প্রস্তুত হয়। যখন গাড়ী একেবারে ষ্টেশনের কাছে এসে যায় তখন আর একবার ঘণ্টা বাজিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয় যে গাড়ী প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করেছে।

গাড়ী প্ল্যাটফর্মে এসে থামে। যাত্রীরা যারা নামবার তারা নেমে যায়, আর যারা চড়বার তারা এক এক করে গাড়ীতে উঠতে থাকে। যাত্রীদের সঙ্গে বিছানা, ট্রাঙ্ক, সুটকেশ ইত্যাদি অনেক মালপত্র থাকে। গাড়ীতে ঐসব মাল রাখবার উপযুক্ত জায়গা আছে। বসবার বেঞ্চির ওপরে যাত্রীদের মাথা বরাবর মালপত্র রাখবার জায়গা আছে। তাছাড়া বসবার বেঞ্চির নীচেও জিনিষপত্র রাখা যায়। তবে যদি কোন যাত্রীর সঙ্গে অত্যধিক মালপত্র থাকে—তারজন্য তাকে অতিরিক্ত ভাড়া দিতে হয়। এই ধরণের মাল রাখবার জন্য গাড়ীর সঙ্গেই লাগানো আলাদা কামরা থাকে।

রেলগাড়ীতে যাত্রীদের জন্য তিন প্রকার কামরা থাকে। প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী এবং তৃতীয় শ্রেণী। প্রত্যেক শ্রেণীরই আলাদা আলাদা ভাড়া। এর মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়াই সবচেয়ে কম। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া তৃতীয় শ্রেণীর প্রায় দ্বিগুণ। প্রথম শ্রেণীর ভাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীর চেয়েও

বেশী। গাড়ীর একেবারে শেষের দিকে থাকে গার্ডের কামরা। যখন গার্ড সবুজ নিশান দেখায় তখন ড্রাইভার গাড়ী চালাতে সুরু করে।

চলন্ত গাড়ীতে টিকিটচেকার বাবু যাত্রীদের টিকিট দেখতে আসেন। যদি কোন যাত্রী বিনা টিকিটে ভ্রমণ করে তবে তাকে জরিমানা দিতে হয়। রেলে বিনা টিকিটে ভ্রমণ করাকে গুরুতর অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়।

যাত্রীরা যখন গাড়ী থেকে নেমে ষ্টেশনের বাইরে যায় তখন প্ল্যাটফর্মের প্রবেশমুখে দাঁড়ানো আর একজন টিকিট-চেকারের কাছে টিকিটটা জমা দিয়ে যায়। যদি তখন কোন যাত্রী নিজের টিকিট দেখাতে না পারে তবে তাকে ষ্টেশনের বাইরে যেতে দেওয়া হয় না, পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া হয়—কেননা, তোমরা আগেই জেনেছ যে বিনা টিকিটে ভ্রমণ করা একটা অপরাধ।

ভারতবর্ষে রেল চালু হয়েছে একশ বছরের ওপর। এই একশ বছরে রেলের অনেক উন্নতি হয়েছে। আজকাল প্রতিদিন শত শত রেলগাড়ী যাত্রী নিয়ে ও মাল নিয়ে দেশের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে যাতায়াত করছে।

রেলগাড়ী চালু হওয়াতে মানুষের খুব সুবিধা হয়েছে। লোকে অতি সহজেই দূরস্থিত আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা করে আসতে পারে।

অনুশীলনী

কি কি শিখলে—

১। রেলগাড়ীতে চড়ে আমরা দেশের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে অনায়াসে যাতায়াত করতে পারি ?

২। আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্যে, তীর্থযাত্রার জন্য, দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখবার জন্য অথবা ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে লোকদের একস্থান থেকে আর এক স্থানে যাওয়ার প্রয়োজন হয়।

৩। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের আমলে একজায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাতায়াত করা বড়ই অসুবিধাজনক ছিল। তখন রেল বা মোটর কিছুই ছিল না বলে যাতায়াতে অনেক সময়ও লেগে যেতো।

৪। রেলে ভ্রমণ করাই সবচেয়ে সুবিধাজনক। রেল দিবারাত্র চলে। যাত্রীদের কোন কষ্ট হয় না।

বলতো ?—

১। রেলভ্রমণ করতে হলে আমাদের প্রথমে কি কি করা উচিত ?

২। 'প্ল্যাটফর্ম' কাকে বলে ?

৩। 'এন্‌কোয়ারী' অফিস কি কি কাজ করে ?

৪। সিগ্‌ন্যালের কাজ কি ?

৫। যাত্রাকালে বেশী মালপত্র থাকলে কি করা উচিত ?

৬। বিনা টিকিটে ভ্রমণ করলে কি হয় ?

খেলা ধূলায়—

১। বাবার সঙ্গে ষ্টেশনে গিয়ে দেখ টিকিট কোথায় পাওয়া যায় ও প্ল্যাটফর্ম কোথায়? এন্‌কোয়ারী অফিসে গিয়ে কল্‌কাতার গাড়ী কোন্ সময়ে আসবে খোঁজ নাও।

২। কয়েকজন ছেলেমেয়ে লাইন করে দাঁড়াও। একজন আর একজনের কোমরে হাত দিয়ে রেলগাড়ী হয়ে যাও। একজন গার্ড হও। গার্ডের হাতে লাল ও সবুজ কাগজের তৈরী দুটো নিশান থাকবে। এইভাবে রেলগাড়ীর খেলা খেল।

৩—সার্ব্বজনীন সম্পত্তির যত্ন নেওয়া

শিক্ষক—অশোক বলতো সম্পূর্ণ নিজস্ব বলতে তোমার কি কি জিনিষ আছে ?

অশোক—আমার বই খাতা পেন্সিল, সার্ট, প্যাণ্ট, জুতো, মোজা এ সবই আমার নিজের জিনিষ।

শিক্ষক—আর তোমার বাড়ীতে যে টেবিল, চেয়ার, খাট, আলমারী বা রেডিও আছে সেগুলো কার জিনিষ ?

অশোক—স্যার, সেগুলো তো মা বাবার জিনিষ।

শিক্ষক—কেন, শুধু মা বাবার জিনিষ বলছ কিসের জন্য ? চেয়ার টেবিলে বসে তো তুমিও কাজ কর নয় কি ? রেডিও নিশ্চয় তুমিও শোন ! তবে ঐ গুলি তোমার জিনিষ নয় কেন ?

অশোক—হ্যাঁ স্যার, ঐ জিনিষগুলি আমাদের সকলেরই ! আমরা সবাই সেগুলি ব্যবহার করি।

শিক্ষক—আচ্ছা, তোমাদের শ্রেণীতে এই যে ব্লাকবোর্ড এবং দেওয়ালে চার্ট দেখছ, এগুলি কার বল তো।

রবীন—স্যার, এগুলি আমাদের স্কুলের জিনিষ।

শিক্ষক—আর এই যে তোমাদের পানীয় জলের কল, পায়খানা রয়েছে এগুলি কাদের

প্রবীর—স্যার, এগুলিও আমাদের স্কুলের।

শিক্ষক—ব্লাকবোর্ডে তোমাদের অঙ্ক বোঝান হয়, চার্টের সাহায্যে তোমাদের পড়া বোঝান হয়। তারপর কলের জল তোমরা সকলেই খেয়ে থাক এবং পায়খানাও তোমরা সকলেই ব্যবহার কর-তাই নয় কি ?

প্রবীর, অশোক—হ্যাঁ স্যার !

শিক্ষক—তা'হলে তো এ সমস্ত জিনিষ তোমাদের সকলেরই প্রত্যেকের কাজেই যখন এগুলি লাগছে ? আচ্ছা আর একটা কথা তোমাদের জিজ্ঞেস করছি—বলতো রাস্তা ঘাটে যে সব বৈদ্যুতিক আলো আছে সেগুলি কার ?

রমেন—যে অফিস থেকে আলো জ্বালানো হয় সেগুলি তাদের জিনিষ।

শিক্ষক—না ! এই সমস্ত আলো তো আমাদের প্রত্যেকের সুবিধার জন্যই লাগানো হয়েছে। আলো না থাকলে আমাদের রাত্রে চলাফেরার খুবই অসুবিধে হ'তো। আলো থাকাতে প্রত্যেকেরই লাভ হয়েছে। সেই জন্য এগুলিও আমাদের সকলেরই জিনিষ।

অরুণ—কিন্তু স্যার, স্কুলের বোর্ড, চেয়ার, টেবিল তো

আমরা কেউ কিনি নি ! তা'হলে এগুলো আমাদের জিনিষ হ'লো কি করে ?

কমলেশ—হ্যাঁ, স্যার ; রাস্তা ঘাটের আলোর ব্যবস্থাও তো আমরা কেউ করিনি। সেগুলিই বা আমাদের হ'লো কি করে ?

শিক্ষক—আচ্ছা আমি বলছি শোন ! স্কুলের এই সমস্ত জিনিষ এবং রাস্তা ঘাটের আলোর মত আরও কতক-গুলি জিনিষ আছে, যেমন রেল, বাস, ট্রাম, উড়ো জাহাজ টেলিগ্রাফের পোষ্ট, টেলিফোন ও বিদ্যুতের তার, চিঠির বাক্স, রাস্তাঘাটের টিউবওয়েল, ছোটদের খেলাধূলো করবার পার্ক, বাগান, লাইব্রেরী, হাসপাতাল—আর কত নাম

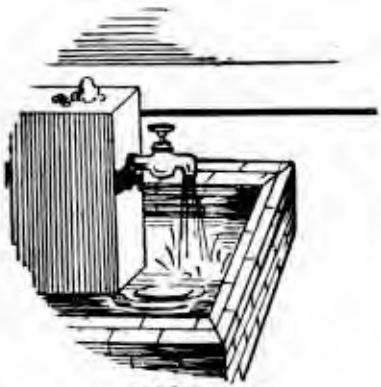

করবো ?—এই রকম শত শত জিনিষ আছে। সমস্ত জিনিষই লোকদের সুবিধার জন্য সরকার পক্ষ থেকে তৈরী করা হয়েছে। অবশ্য তোমরা প্রশ্ন করতে পার যে এই সব জিনিষ তৈরী করবার জন্য টাকা সরকার কোথা থেকে পায়? তার উত্তরে জেনে রাখ যে ঐ টাকা সরকার আমাদের কাছ থেকেই নানাভাবে আদায় করে নেয়। সেই জন্য ঐ সব জিনিষ আমাদেরই হয়ে গেছে। যদি কেউ এ সমস্ত জিনিষ নষ্ট করে তবে তাদের নিজেদেরই ক্ষতি হয়। নিজেদের জিনিষই তারা নষ্ট করে।

রেল, উড়োজাহাজ, ডাক ও তার বিভাগ, বাস ইত্যাদির পরিচালনা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। অল্প কয়েকজন লোকের পক্ষে এগুলো পরিচালন করা সম্ভবপর নয়। এইগুলি সমগ্র দেশের সম্পত্তি। সেই জন্য প্রত্যেকেরই এগুলো নিজের জিনিষ বলে মনে করা উচিত।

তাহলে তোমরা বুঝতে পারছ যে এমন কতগুলো জিনিষ আছে যেগুলো প্রত্যেকেরই নিজস্ব। যেমন তোমাদের কাপড়, জুতো, বই ইত্যাদি। এই জিনিষগুলো ভাল করে সামলে রাখার দায়িত্ব তোমাদের নিজেদেরই।

আবার এমন কতগুলো জিনিষ আছে যেগুলো নাকি সমগ্র পরিবারের পক্ষেই প্রয়োজনীয়। যেমন ঘরের টেবিল, চেয়ার, রেডিও এবং ঐ ধরনের আরও অন্যান্য জিনিষ।

কাজেই এগুলোর যত্ন নেওয়া পরিবারের বড় ছোট সকলেরই উচিত।

তারপর তোমাদের স্কুলের জিনিষ পত্রের কথাই ধর না কেন। স্কুলের বেঞ্চি, চেয়ার টেবিল, ব্ল্যাকবোর্ড এসব ছাত্রদেরই কাজে লাগে। সেইজন্য এগুলো দেখা শোনা করার দায়িত্ব প্রত্যেক ছাত্ররই নেওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালয়কে ছাত্রদের আর একটা বাড়ী বলে মনে করা উচিত। বাড়ীতে যেমন মা বাবারা ছেলেমেয়েদের দেখা শোনা করেন বিদ্যালয়ে শিক্ষকরাও সে রকম ছাত্রদের দেখা শোনা করেন—তাদের ভাল ভাল শিক্ষা দেন। বিদ্যালয়ে একই শ্রেণীতে পাঠরত ছাত্রছাত্রীরাও পরস্পরের ভাই বোনেরই সমান। বাড়ীর জিনিষপত্র যেমন তোমরা ঠিকমত দেখে শুনে রাখ, বিদ্যালয়ের জিনিষপত্রও সেরকম ভাবে দেখে শুনে রাখবে। বিদ্যালয়ের কোন জিনিষপত্র ভেঙ্গেচুরে নষ্ট করবে না বা অপরিষ্কার করবেনা। এগুলো তোমাদেরই জিনিষ কাজেই নষ্ট করলে তোমাদেরই ক্ষতি।

এই ধরণের আরও কতগুলো জিনিষ আছে যেগুলোকে সমাজ অথবা জনসাধারণের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। যেমন-রাস্তা ঘাট বা বাজারের পানীয় জলের কল, রাস্তার বৈদ্যুতিক আলো, লাইব্রেরী, ইত্যাদি। এগুলোকে বলা হয় সার্ব্বজনীন সম্পত্তি। এই সমস্ত জিনিষেরও আমাদের

যত্ন নেওয়া উচিত। এগুলো যাতে খারাপ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা সকলেরই উচিত। সমাজ একটা বড় পরিবারের মত। সমাজ কে বাদ দিয়ে আমরা চলতে পারি না। সেই জন্য সমাজের জিনিষকেও নিজেদের জিনিষ বলে মনে করা উচিত এবং নিজেদের জিনিষের মতই তারও যত্ন করা উচিত।

রেল, ডাক-তার এবং ঐ ধরণের অন্যান্য জিনিষ আমাদের দেশের—আমাদের রাষ্ট্রের সম্পত্তি। এগুলোর যথার্থ ব্যবহার করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। রেলে করে কোথাও যাবার সময় রেলের কামরা অপরিষ্কার করা উচিত নয়। জানালার কাঁচ বা কামরার আলো, পাখা ইত্যাদি যাতে নষ্ট না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত।

আমাদের এই দেশকেও একটা বিরাট পরিবারের মতই মনে করা উচিত। আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাবার জন্য সমগ্র দেশের ওপরই নির্ভর করতে হয়। সেইজন্য দেশের যাতে ক্ষতি হয় সেরকম কোন কাজ আমাদের করা উচিত নয়। দেশের লাভেই আমাদের লাভ একথা সব সময়ই মনে রাখা দরকার।

নিজেদের এবং বাড়ীর জিনিষপত্র আমরা যেমন সাবধানের সঙ্গে ব্যবহার করি, কোনরকম নষ্ট করি না, অপরিষ্কার করি না বা ভাঙ্গি না সেই রকম সমাজ বা রাষ্ট্রের সম্পত্তিও আমাদের সযত্নে রক্ষা করা উচিত।

অনুশীলনী

কি কি শিখলে ?—

১। কতকগুলো জিনিষ সম্পূর্ণ আমাদের নিজস্ব, কতগুলো সমগ্র পরিবারের, কতকগুলো সমাজের এবং কতকগুলো আমাদের দেশের।

২। ঐ সমস্ত জিনিষ আমাদের সাবধানে রক্ষা করা উচিত তাতে আমাদেরই লাভ।

৩। সরকারের পক্ষ থেকে যে সব কাজ করা হয় সে সব জনসাধারণের পয়সা থেকেই করা হয়। সেজন্য সরকারী জিনিষের ক্ষতি হ'লে নিজেদেরই ক্ষতি হয়।

৪। রেল ও ডাক বিভাগ পরিচালনা করা অথবা রাস্তাঘাটে জল ও আলোর ব্যবস্থা করা মাত্র কয়েকজন লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। এগুলো সরকারই করতে পারে।

বলতো ?—

১। সার্ব্বজনীন সম্পত্তি কাকে বলা হয় ?

২। বিদ্যালয়ের কোন্ কোন্ জিনিষ তোমাদের কাজে লাগে ?

৩। জনসাধারণের জন্য সরকার পক্ষ থেকে কি কি করা হয় ?

খেলা ধূলায়—

১। বিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসব অথবা দেওয়ালীর পূর্ব্বে বিদ্যালয় পরিষ্কার কর।

৪—সমাজ সমস্যা দূরীকরণে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান

(ক) গ্রাম পঞ্চায়েত

অশোক—স্যার, আপনি সেদিন বলেছিলেন যে জন-সাধারণের সম্পত্তি—যেমন স্কুল, হাঁসপাতাল, জলের কল, বৈদ্যুতিক আলো ইত্যাদির যত্ন নেওয়া সকলেরই উচিত। কিন্তু এগুলি কারা তৈরী করেছে সে সম্বন্ধে তো কিছু বলেন নি ?

রমেন—স্যার, গ্রামেও কি এই সমস্ত জিনিস আছে ?

শিক্ষক—আগে আমি অশোকের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি, শোন। শহরে এইসমস্ত জিনিস পৌরসভা বা মিউনিসিপ্যাল কমিটিই তৈরী করে। কয়েকটি বড় বড় শহরে মিউনিসিপ্যাল কমিটির পরিবর্ত্তে কর্পোরেশন থাকে। যেমন আমাদের দিল্লীতে আছে। আগে এখানে মিউনিসিপ্যাল কমিটি ছিল এখন কর্পোরেশন হয়েছে।

গ্রামে এই ধরণের কাজ গ্রাম পঞ্চায়েত করে থাকে। আগে পঞ্চায়েতের বিষয় তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি—মিউনিসিপ্যাল কমিটি সম্বন্ধে আর একদিন বলবো।

গ্রামে অনেক পরিবার বাস করে তাদের প্রত্যেকেরই নানারকম জিনিসের প্রয়োজন হয়। যতটা সম্ভব তারা নিজেদের প্রয়োজন নিজেরাই মিটিয়ে নিতে চেষ্টা করে, কিন্তু এমন কতকগুলি জিনিস আছে যেগুলি সকলেরই প্রয়োজনে লাগে। যেমন ধর, গ্রামের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা! গ্রাম পরিষ্কার থাকলে সকলেরই লাভ। সকলের স্বাস্থ্যের জন্যই সেটা প্রয়োজন। সেইরকম গ্রামের রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, রাত্রিবেলা রাস্তাঘাটে আলোর ব্যবস্থা করা, পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করা ইত্যাদির প্রয়োজন সমস্ত গ্রামবাসীদেরই হয়ে থাকে। কিন্তু কোন একজন লোক বা একটি পরিবার একা এইসব কাজগুলি করতে পারে না।

শ্যামল—তা হ'লে এই কাজগুলি কারা করে?

শিক্ষক—এই সমস্ত কাজ এবং সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় এই ধরণের আরও অন্য কাজ করবার জন্য গ্রামবাসীরা সকলে মিলে একটা পঞ্চায়েত তৈরী করে। এই গ্রাম পঞ্চায়েতই গ্রামের সমস্ত সাধারণ কাজগুলি করে থাকে।

গ্রামবাসীরা পঞ্চায়েতের জন্য পাঁচ জন লোক কে নির্ব্বাচন করে। একুশ বছরের নীচে কোন লোক এই নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারে না।

পঞ্চায়েতের যিনি প্রধান তাকে বলা হয় মোড়ল বা মণ্ডল। মোড়লকে সবাই মান্য করে ও সকলেই তার কথা শুনে চলে।

পঞ্চায়েত তার কর্ম্মচারীদের সাহায্যে গ্রামে স্বচ্ছ পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করে, কূপ, পুষ্করিণী ইত্যাদি খনন করে। এই জল যাতে কেউ অপরিষ্কার না করে সেদিকেও তাদের দৃষ্টি থাকে। এ ছাড়া গ্রামের সীমানার মধ্যে রাস্তাঘাট তৈরী করা বা মেরামত করা, গ্রাম পরিষ্কার রাখা, লোকের যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করা

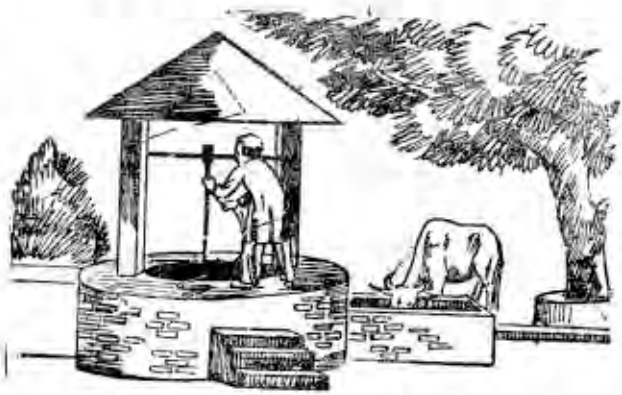

ইত্যাদি যাবতীয় কাজই পঞ্চায়েত করে থাকে। পঞ্চায়েত গ্রামে যত পশু আছে তাদের চরে খাওয়ার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে। গ্রামে কতজন লোক বাস করে, কৃষকদের কার কাছে কত পশু আছে এ সবের হিসাবও পঞ্চায়েত কে রাখতে হয়।

এই সমস্ত কাজের বাইরে পঞ্চায়েতকে আরও কাজ করতে হয়। পঞ্চায়েত গ্রামবাসীদের ছোট খাটো ঝগড়ার

মীমাংসা করে দেয়। কোন কোন পঞ্চায়েত নিজেদের এলাকায় ঔষধালয়, পাঠাগার এবং শিশুদের জন্য স্কুল খুলবারও ব্যবস্থা করে দেয়। কোথাও কোথাও পঞ্চায়েতরা গ্রামবাসীদের কাছে ভাল ভাল বীজ ও রাসায়নিক সার বিক্রীও করে থাকে। এতে গ্রামবাসীদের অনেক উপকার হয়।

কিন্তু এইসব কাজকর্ম্ম ভালভাবে চালাবার জন্য যথেষ্ট টাকাপয়সার প্রয়োজন হয়। সেইজন্য পঞ্চায়েত ক্ষেত, বাড়ীঘর দোকান ইত্যাদির ওপর কর বা টাক্স ধার্য্য করে। এর থেকে যা আয় হয় তা দিয়েই গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেদের খরচ নির্ব্বাহ করে।

এখন ছুটীর ঘণ্টা পড়ে গেছে, বাড়ী যাও। মিউনিসিপ্যাল কমিটির সম্বন্ধে কাল আবার বলবো।

অনুশীলনী

কি কি শিখলে ?—

১। গ্রামে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম্ম গ্রাম পঞ্চায়েত করে থাকে।

২। শহরে ঐ সমস্ত কাজ মিউনিসিপ্যাল কমিটি অথবা কর্পোরেশন করে থাকে।

বলতো ?—

১। পঞ্চায়েত কি কি কাজ করে ?

২। গ্রাম পঞ্চায়েত কি ভাবে নিজের খরচ নির্ব্বাহ করে ?

৩। পঞ্চায়েত প্রধানকে কি বলা হয় ?

খেলা-ধূলায়—

১। কখনও গ্রামে গেলে পঞ্চায়েতের সভায় বসে শুনবে তারা কি কি বিষয়ে আলোচনা করে।

(খ) মিউনিসিপ্যাল কমিটি

অশোক—স্যার, আপনি বলেছিলেন আজ আমাদের মিউনিসিপ্যাল কমিটির বিষয়ে বলবেন ?

শিক্ষক—হ্যাঁ ! সেকথা আমি ভুলিনি। কাল তোমাদের পঞ্চায়েতের কথা বলেছিলাম সে কথা মনে আছে নিশ্চয় ? এখন মিউনিসিপ্যাল কমিটির বিষয় বলছি শোন।

গ্রামে যে সব কাজ পঞ্চায়েত করে থাকে শহরে সেই সমস্ত কাজ মিউনিসিপ্যাল কমিটিকে করতে হয়। তবে গ্রামের চেয়ে শহরে বেশী লোক থাকে বলে মিউনিসিপ্যাল কমিটিকে কাজও পঞ্চায়েতের চেয়ে অনেক বেশী করতে হয়।

পঞ্চায়েত অপেক্ষা মিউনিসিপ্যাল কমিটির আয়ও প্রচুর। আবার আয় যেমন প্রচুর তেমন শহরবাসীদের সুখসুবিধার ব্যবস্থা করার জন্য খরচও প্রচুর।

গ্রামবাসীরা যেমন পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করেন, শহরের লোকেরাও সেরকম তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি দেখাশোনার জন্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করেন। এই প্রতিনিধিদের নিয়ে যে সমিতি তৈরী হয় তাকে মিউনিসিপ্যাল কমিটি বলা হয়।

প্রত্যেক শহরকে পাড়া হিসাবে কয়েকটি ভাগে ভাগ

করা হয়ে থাকে তারপর প্রত্যেক ভাগ থেকে এক একজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হয়। ঐসব প্রতিনিধিরা আবার নিজেদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি ও আর একজন সহ সভাপতি নির্ব্বাচন করেন। মিউনিসিপ্যাল কমিটির সভাপতিকে বলা হয় চেয়ারম্যান। মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য আবার কতগুলি ছোট ছোট কমিটি গঠন করা হয়। এই সব কমিটিরও প্রত্যেকটিতে একজন করে সভাপতি থাকে। মিউনিসিপ্যাল কমিটি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সদস্যরাই এই সব কমিটিতে থাকে। কমিটিগুলির প্রধান কাজ হ'ল স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গৃহনির্ম্মাণ ও শহরের উন্নতির পরিকল্পনা করা এবং কর আদায় করা।

মিউনিসিপ্যাল কমিটি শহরের পানীয় জল, স্বাস্থ্য, রাস্তার আলো, শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ের ব্যবস্থা ও সাহায্য করে। তাছাড়া কমিটির পক্ষ থেকে পাঠাগার, হাঁসপাতাল ইত্যাদিও খোলা হয়। বেড়াবার জন্য মিউনিসিপ্যাল কমিটির পার্কও থাকে। শহর যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে সেজন্য মিউনিসিপ্যাল কমিটি মেথরের ব্যবস্থা করে। এছাড়া, পচা, গলা ও বাসি জিনিষপত্র যাতে কেউ বিক্রী না করে সেদিকেও তাদের কড়া নজর থাকে। ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করে ও রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ করে কমিটি সকলের উপকার সাধন করে।

মিউনিসিপ্যাল কমিটির আয় নানাভাবে হয়ে থাকে। শহরের বাইরে থেকে যে সব জিনিস আসে কমিটি তাদের ওপর কর ধার্য্য করে। মোটর, টাঙ্গা, রিক্সা, গরুর গাড়ী, সাইকেল ইত্যাদির মালিকদেরও কর দিতে হয়। এছাড়া বাড়ী, দোকান, সিনেমা ও অন্যান্য আমোদ প্রমোদের ওপরেও কমিটি কর বসিয়ে থাকে। এই সব কর বা ট্যাক্স থেকে যে আয় হয় তার থেকেই কমিটির খরচ নির্ব্বাহ হয়।

বড় বড় শহরগুলি যেমন বোম্বাই, দিল্লী, কলকাতা ইত্যাদি স্থানে মিউনিসিপ্যাল কমিটির স্থানে কর্পোরেশন থাকে। কর্পোরেশনের সদস্যদের বলা হয় কাউন্সিলার ও সভাপতিকে বলা হয় মেয়র বা শহরের প্রধান নাগরিক।

মিউনিসিপ্যাল কমিটি ও কর্পোরেশন নিজ নিজ এলাকার লোকদের স্বাস্থ্যের প্রতি খুব লক্ষ্য রাখে। তারা শিশুদের জন্য পার্ক তৈরী কোরে ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কোরে জনসাধারণের কল্যাণ করে।

অনুশীলনী

কি কি শিখলে ?—

১। গ্রামে যে কাজ পঞ্চায়েত করে, শহরে সে কাজ মিউনিসিপ্যাল কমিটি অথবা কর্পোরেশন করে থাকে।

২। প্রত্যেক শহরকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক ভাগ থেকে একজন করে প্রতিনিধি

নির্ব্বাচন করে মিউনিসিপ্যাল কমিটি বা কর্পোরেশন গঠন করা হয়।

৩। শহরের লোকসংখ্যা বেশী থাকায় মিউনিসিপ্যাল কমিটিকে অনেক বেশী কাজ করতে হয়। মিউনিসিপ্যাল কমিটির আয়ও অনেক বেশী।

বল তো?—

১। মিউনিসিপ্যাল কমিটির সভাপতি কি ভাবে নির্ব্বাচিত হয়?

২। মিউনিসিপ্যাল কমিটি কি কি কাজ করে?

৩। মিউনিসিপ্যাল কমিটির আয় কি ভাবে হয়?

৪। গ্রাম পঞ্চায়েত ও মিউনিসিপ্যাল কমিটির মধ্যে পার্থক্য কি?

খেলা ধূলায়—

১। তোমাদের শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা মিলে একটি 'সাফাই-সমিতি গঠন কর।

৫—শিশু দিবস

শিক্ষক—ছেলেমেয়েরা ! কাল তোমরা কেউ বই নিয়ে স্কুলে এসোনা, কাল শিশু দিবস, স্কুলে কাল একটা সভার আয়োজন করা হবে। পতাকা উত্তোলন করা হবে এবং গান ও নানারকম আমোদ প্রমোদ করা হবে।

কমলেশ—শিশু দিবস কাকে বলে স্যার ?

শিক্ষক—'শিশু দিবস' কথাটার মানে হচ্ছে 'বাচ্চাদের দিন' প্রতি বছর ১৪ই নভেম্বর শিশু দিবস পালন করা হয়। ১৪ই নভেম্বর আমাদের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর জন্ম দিন। তোমরা নিশ্চয়ই জান যে পণ্ডিতজী—ছোট ছোট বাচ্চাদের কি রকম ভালবাসেন।

সুরেন—স্যার ! ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও তো নেহরুজীকে খুব ভালবাসে, আর সেইজন্যই তো চাচা নেহরু বলে তাকে ডাকে। কিন্তু শিশু দিবস আর চাচা নেহরুর জন্মদিন একই দিনে কেন পালন করা হয় ?

শিক্ষক—তার কারণ নেহরুজী জন্মদিনে বাচ্চাদের সঙ্গেই কাটাতে ভালবাসেন, তিনি ঐ দিন বাচ্চাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন, তাদের সঙ্গে খেলাধূলা করেন ও তাদের মিষ্টি বিতরণ করেন, ঐ দিন বাচ্চারা তাদের প্রিয় চাচাজীকে

ফুলের মালা উপহার দেয়। জহরলালজী বাচ্চা এবং ফুল দুইই খুব ভালবাসেন, তোমরা হয়তো লক্ষ্য করে থাকবে তিনি তাঁর কোটে সর্ব্বদাই একটা গোলাপফুল লাগিয়ে রাখেন। নেহরুজী দেশের সব বাচ্চাদেরই ফুলের মত হাসি মুখ দেখ্‌তে পছন্দ করেন। ফুল যে রকম চারিদিকে নিজের সুগন্ধ বিলিয়ে সবাইকে আনন্দদান করে শিশুরাও সেরকম নিজেদের ভাল ব্যবহার দ্বারা সকলের মন জয় করুক এটাই নেহরুজীর ইচ্ছা, তাদের ভাল ভাল কাজের দ্বারা যেন দেশের গৌরব বৃদ্ধি পায়। বাচ্চারা যেন খারাপ কিছু না শেখে। ভাল ভাল কাজ করে যেন সবার প্রিয় হতে পারে।

বাচ্চাদের সম্বন্ধে জহরলালজী একবার বলেছিলেন—"ভারতের শিশুরাই ভারতের ধন—ভারতের সম্পত্তি—তারাই ভারতের ভবিষ্যৎ। শিশুদের চোখেই আমি আগামী ভারতের প্রতিচ্ছবি দেখ্‌তে পাই। সুতরাং তাদের তাচ্ছিল্য করাটা খুবই অন্যায়।"

শিশুদের প্রতি জহরলাল সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য রাখেন কারণ তিনি জানেন যে এরাই বড় হয়ে দেশের নেতা হবে। এদেরই মধ্যে কেউ প্রধান মন্ত্রী, কেউ সেনাপতি, কেউ রাষ্ট্রপতি হবে। এরাই বড় হয়ে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করবে। সেইজন্যই শিশুদের ভালরকম দেখাশোনা করা

উচিত। তাদের লেখাপড়া, স্বাস্থ্য এবং অভ্যাস যাতে ভালভাবে গড়ে ওঠে সেদিকে পূর্ণ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

তিনি চান বিপদকে যেন শিশুরা ভয় না করে। কাজে ফাঁকি দেওয়ার মত প্রবৃত্তি যেন তাদের না হয়। তাদের শরীর ও মন দুইই যেন দৃঢ় ভাবে গড়ে ওঠে। তারা যেন শৃঙ্খলা প্রিয় ও সাহসী হয়। তবেই তারা ভারতমাতার সেবা করতে সক্ষম হবে।

অশোক—স্যার! আমিও বড় হয়ে চাচা নেহরুর মত দেশের সেবা করবো।

রমেন—আমি ডাক্তার হবো। ডাক্তার রোগীদের ভাল করে দেয়।

শিক্ষক—হ্যাঁ—রোগীকে ভাল করলেও দেশের সেবা করা হয়। যে কোনও ভাল কাজের দ্বারাই দেশের সেবা করা যায়। একজন ঝাড়ুদারও তার কাজের দ্বারা দেশেরই সেবা করে যাচ্ছে। সে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দ্বারা দেশের লোকদের স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে সাহায্য করছে।

এই কারণেই নেহরুজী ঠিক করেছেন তাঁর জন্মদিনে শিশুদিবস পালন করা হবে।

সমস্ত ভারতবর্ষেই শিশুদিবস উৎসব পালন করা হয়ে থাকে ঐ উপলক্ষে বিশেষ ধরণের ডাক টিকিট ছাপা হয় এবং ভারতের সমস্ত ডাকখানা ঐ টিকিটগুলো সেই দিনে

বিক্রী করে। এর থেকেই বুঝতে পারা যায় যে সমগ্র দেশে শিশুদের কতখানি সম্মান দেওয়া হয়!

কাল তোমাদের বিদ্যালয়ে খেলাধূলা, ব্যায়াম এবং গান বাজনার আয়োজন করা হয়েছে। শুধু তোমাদের বিদ্যালয়ে নয়—কাল সমস্ত বিদ্যালয়গুলিতেই এই রকম উৎসব পালন করা হবে।

অনেক বিখ্যাত লোকেরা বাচ্চাদের এই সভায় উপস্থিত থাকেন। তাঁরা তাঁদের ভাল ভাল উপদেশ প্রদান করেন, বড় বড় লোকদের জীবনী শোনান। রেডিওতে এইদিন বাচ্চাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান থাকে।

মা বাবারা যেমন বাচ্চাদের কিসে ভাল হবে সেকথা চিন্তা করেন, তাদের ভালবাসেন, খাওয়া দাওয়া, লেখাপড়া, খেলাধূলা, পোষাক ইত্যাদি সব বিষয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন, সেই রকম গ্রাম ও সহরের লোকদেরও বাচ্চাদের প্রতি খুব লক্ষ্য থাকে। তাঁরা বাচ্চাদের জন্য স্কুল, লাইব্রেরী, ও হাঁসপাতাল খোলেন ও খেলার জন্য পার্ক তৈরী করে দেন।

আবার যে ভাবে মা, বাবা, আত্মীয় স্বজন এবং গ্রাম বা সহরের লোকেরা বাচ্চাদের দিকে দৃষ্টি রাখেন ঠিক সেই ভাবে দেশের বড় বড় নেতারাও বাচ্চাদের কিসে ভাল হবে সেই বিষয়ে চিন্তা করেন।

রমেশ—স্যার! চাচা নেহরু আমাদের দেশের নেতা —তাই না?

শিক্ষক—হ্যাঁ, তিনি একাধারে দেশ নেতা এবং প্রধান মন্ত্রী, দেশের সব বড় বড় লোকরাই চান যে বাচ্চারা পরিশ্রমী, স্বাস্থ্যবান ও সাহসী হোক, পরস্পর মিলেমিশে কাজ করতে শিখুক ঝগড়াঝাঁটি থেকে অনেক দূরে থাকুক। শিশু কাল থেকেই তারা সদভ্যাসগুলো আয়ত্ব করুক। বাড়ী তৈরী করবার সময় প্রথমে তার সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করে নিতে হয়, সেই রকম মানুষের জীবনরূপ বাড়ীর ভিত্তিও শিশুকালেই সদভ্যাসের দ্বারা দৃঢ় করে নিতে হয়। ভিত্তি যদি মজবুত ও শক্ত হয় তবে ঝড়বৃষ্টি বা ভূমিকম্পেও বাড়ী অটল থাকে। সেইরকম যে সব বাচ্চা শৈশবে সদভ্যাস আয়ত্ব করবে তারা জীবনে সুখী হতে পারবে।

বাচ্চাদের আরও কর্ত্তব্য আছে। বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান তাদের অবশ্যই দেখানো উচিত। তাঁরা বাচ্চাদের ভালর জন্য যে সব কথা বলেন সেগুলো মেনে চলা উচিত। এ ছাড়া নিজের দেশকে ভালবাসা উচিত ও নিজেদের—কর্ম্মের দ্বারা দেশের গৌরব বৃদ্ধি করা উচিত।

অনুশীলনা

কি কি শিখিলে?—

১। শিশু-দিবস উপলক্ষে বিদ্যালয়ে ছোটদের সভা হয়। খেলা, গান ও বক্তৃতা হয়।

২। চাচা নেহরু বাচ্চাদের খুব ভালবাসেন। বাচ্চারাও চাচা নেহরুকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে।

৩। শিশুরাই বড় হয়ে দেশের বড় বড় কার্য্যভার গ্রহণ করবে। সেইজন্য তাদের সৎ, স্বাস্থ্যবান ও পরিশ্রমী হতে হবে।

বলতো ?—

১। শিশু-দিবস কোন দিনটিতে পালন করা হয় ?

২। চাচা নেহরুর জন্মদিন কবে ?

৩। তুমি বড় হয়ে কি হতে চাও ?

৪। বাচ্চাদের কিরকম হওয়া উচিত ?

৫। বাচ্চারা ভারতের সম্মান কি করে বাড়াতে পারে ?

৬। চাচা নেহরু কোন্ বিষয়ে সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য রাখেন ?

খেলাধূলায়—

১। শিশু-দিবসের টিকিট নিজের এ্যালবামে লাগাও।

২। চাচা নেহরুর সুন্দর একটি ছবিও এ্যালবামে রাখ।

Price Re. 1·33 nP.